ভিক্টর হ্যুগো
অবলম্বনে
এক বৃদ্ধ
ও
তিন শিশুর
গল্প
অম্বরীষ রাহা

ভিক্টর মারি হ্যুগোর 'নাইনটি থ্রি' অবলম্বনে

# এক বৃদ্ধ ও তিন শিশুর গল্প

অম্বরীষ রাহা

সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি

পরিবেশক ও প্রাপ্তিস্থান ঃ

ইণ্ডিয়ান বুক মার্ট
১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলকাতা-৭০০০৭৩

সঞ্জীব প্রকাশনী
১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী
১১০ বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০০০৪

দত্ত বুক স্টল
৮/১ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

দাম—পনের টাকা

প্রকাশক ঃ সুখেন্দ্রনাথ রাহা, সভাপতি, সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ৩৮ ওল্ড ক্যালকাটা রোড, গ্রীণ পার্ক, পোঃ তালপুকুর, ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা। পিন ঃ ৭৪৩১৮১

বাবার স্মৃতিতে

## ভূমিকা

পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঘটনা। এর একশ' আঠাশ বছর পরেকার রুশ বিপ্লব ছাড়া এর সঙ্গে তুলনা করার মত বিরাট ঘটনা আর ঘটেনি। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানীর বুকে সংঘটিত ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও তীব্র কৃষক সংগ্রাম, ১৬৪০-৪৮ সালে ইংলণ্ডীয় গৃহযুদ্ধ, ১৬৮৮ সালে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লবের ব্যাপকতর, উজ্জ্বলতর অনুক্রম হিসেবে ঘটেছিল ১৭৮৯-৯৩ সালের এই ফরাসি বিপ্লব।

সে সময় ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বোর্বোঁ রাজবংশ। সারা ইউরোপ জোড়া তার খ্যাতি, প্রতিপত্তি। কিন্তু ভেতরে ফোঁপরা হয়ে গেছে। অভিজাত ও যাজকরা কোন কর দিত না। রাজতন্ত্রের বিলাসিতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের খরচ যোগাতে বাধ্য হত শহরের বণিক সম্প্রদায়, কারিগররা এবং অগণিত কৃষক। এদেরই বলা হত থার্ড এস্টেট ( তৃতীয় শ্রেণী )। রাজকোষের অবস্থা দেখে রাজা ষোড়শ লুই বাধ্য হন ফরাসি সংসদ 'স্টেটস জেনারেল'-এর সভা আহ্বান করতে, ১৬১৪ সালের পর এই প্রথম এ সভার অধিবেশন শুরু হল। ফরাসি বিপ্লবের বীজ বপন করা হল। ভলতেয়ার ও রুশো এর জমি আগেই তৈরি করেছেন।

১৭৮১ সালের ৫ মে ভার্সাই শহরে স্টেটস জেনারেল বসল। ১৭ই জুন থার্ড এস্টেট নিজেদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ( জাতীয় সভা ) বলে ঘোষণা করল, ৯ই জুলাই তার নাম হল কনস্টিচুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ( গণ পরিষদ )। রাজা বাধ্য হলেন নতি স্বীকার করতে। কিন্তু রাণী মেরি আঁতোয়ানেৎ এবং তাঁর বন্ধুদের মতলব ছিল খারাপ। বিদ্রোহী প্রজাদের শায়েস্তা করতে তাঁরা বিদেশি সৈন্যদের আমদানি করার চক্রান্ত করলেন। ফলে প্যারিসের বিপ্লবী মানুষ চূর্ণ করল বাস্তিল ; নগরীর উপকণ্ঠে এক ভীষণ দর্শন, দুর্ভেদ্য দুর্গ, রাজতন্ত্রের অত্যাচারের প্রতীক। অগণ্য বিপ্লবী বাস্তিলের অন্ধকারে চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে। সেই থেকে বাস্তিল অধিকারের এই দিনটিকেই, ১৪ই জুলাই ১৭৮৯, ফরাসি বিপ্লবের দিন, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার দিন, ফ্রান্সের জাতীয় দিন বলে পালন করা হয়।

ঘটনাস্রোত দ্রুত বয়ে চলল। রাজা টুইলারির প্রাসাদে ফরাসি গণতন্ত্রের হাতে বন্দী, তাদের কবল থেকে পালাতে গিয়েই বিপদ ঘটালেন, ধরাও পড়ে গেলেন (২০ জুন ১৭৯১)। এদিকে আবার রাজার বিচার দাবি করে যারা বিক্ষোভ জানাল, ফ্রান্সের নবগঠিত সৈন্যদল ন্যাশনাল গার্ড তাদের উপর গুলি চালাল (১৭ই জুলাই ১৭৯১)। একদিকে ইংলণ্ড অন্যদিকে অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া* ও রুশিয়া* তখন নতুন ফরাসি রাষ্ট্রের টুঁটি টিপে ধরতে উদ্যত।

এই অবস্থায় বিপ্লবের হাল ধরল চরম বিপ্লবী জ্যাকোবিন দল—রোবসপিয়র, দাঁতোঁ, ম্যারা, সেন্ট জাস্ট। রোবসপিয়র (১৭৫৮-৯৪) ছিলেন এক তরুণ ধীমান কিন্তু বিত্তহীন উকিল, দার্শনিক রুশো (১৭১২-৭৮)র ভক্ত। দাঁতোঁ (১৭৫৯-৯৪) ছিলেন পসারহীন ব্যারিস্টার, কিন্তু সামরিক প্রতিভায় অনন্য। তুলনায় ম্যারা (১৭৪৩-৯৪)-র বয়েস বেশি, বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু দরিদ্র, জন্ম সুইজারল্যাণ্ডে। সেন্ট জাস্ট (১৭৬৭-৯৪), রোবসপিয়রের অনুগামী।

১৭৯২ সালে ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের শত্রুদের দেওয়া শুরু হল মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা—জোসেফ গিলোটিন নামে এক ফরাসি ডাক্তার উদ্ভাবিত এক মুণ্ড কাটার যন্ত্রের নাম গিলোটিন। অজস্র লোক বলি হল গিলোটিনের। ২০ সেপ্টেম্বর দাঁতোঁর নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র বাহিনীর হাতে ভালমির রণক্ষেত্রে প্রুশিয়ার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হল, ফরাসি প্রজাতন্ত্র রক্ষা পেল। ২১ সেপ্টেম্বর রাজাকে অপসারিত করে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল। ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি রাজা ষোড়শ লুইয়ের প্রাণ গেল গিলোটিনে। বিপ্লবের প্রথম দু'বছর যাঁরা বিপ্লবের নায়ক ছিলেন সেই নরমপন্থী গারদঁ্যা নেতাদের এবার গিলোটিন করা শুরু হল। ১০ জুলাই গঠিত হল জন নিরাপত্তা কমিটি—শত্রুদের কবল থেকে বিপ্লবী ফ্রান্সকে রক্ষা করাই তার কাজ। তিনদিন পর ম্যারা খুন হলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের উসকানিতে উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সের ব্রিটানি অঞ্চলে শুরু হয়েছে রাজতন্ত্রী বিদ্রোহ, তারই নাম ভেণ্ডির বিদ্রোহ। রাজতন্ত্রীদের পতাকা ছিল শ্বেত পদ্মফুল আঁকা, টুপিও সাদা, তাই তারা সাদার দল। সাধারণতন্ত্রীদের পতাকা ছিল তেরঙা—সাদা, লাল, নীল, তাদের টুপি লাল। তাই তারা লালটুপির দল বা নীলের দল।

১৭৯৪ সালের ৫ এপ্রিল দাঁতোঁকে প্রাণ নিতে হল গিলোটিনে। রোবস-পিয়র, সেণ্ট জাস্ট এবং আরও অনেক বিপ্লবী অচিরেই তাঁকে অনুসরণ করলেন ( ২৭ জুলাই ১৭৯৪ )। বিপ্লবের শেষ বহ্নি স্ফূরণ দেখা গেল গ্র্যাকাস বাবুফের 'কনস্পিরেসি', ( সমতুল্যদের ষড়যন্ত্র )-এর মধ্য দিয়ে ( ১৭৯৬ )। 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা'-র ধ্বজাধারীরা সে আগুন নিভিয়ে দিতে দ্বিধা করল না। মহান ফরাসি বিপ্লবের সমস্ত সুফল আত্মসাৎ করলেন এক তরুণ কর্সিকান ভাগ্যান্বেষী সৈনিক, নাম তাঁর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

**শক্তি রাহা**

---

* জার্মানি একদা ছিল অসংখ্য রাষ্ট্রে বিভক্ত, প্রুশিয়া তাদের মধ্যে বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী। ১৮৭১ সালে প্রুশিয়ার নেতৃত্বেই জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়।

* রুশিয়া=রুশ ভল্লুক নামে পরিচিত ছিল, ভল্লুক প্রাক্তন জার সাম্রাজ্যের প্রতীক।

ফরাসী-বিপ্লবের দু'শ' বছর পূর্তি
উপলক্ষে পয়লা জানুয়ারি উনিশ শ'
উননব্বই-এ প্রথম প্রকাশ।

## লেখক-পরিচিতি

ভিক্টর হ্যুগো ( ১৮০২—১৮৮৫ )

বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল মহামনীষী ভিক্টর মারি হ্যুগোর জন্ম হয় ফরাসী দেশে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। কৈশোর থেকেই সাহিত্য সাধনার দিকে ছিল তাঁর প্রবল আসক্তি, ততোধিক অনুরাগ ছিল সমাজের সর্বস্তরে মানব-চরিত্র পর্যবেক্ষণের দিকে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি যে অনবদ্য সাহিত্যমঞ্জুষা বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন, তা শুধু ফরাসী সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করে নি, যুগ যুগ ধরে সাহিত্য-রসিক সমাজকে এক সুমহান আদর্শবাদের সন্ধান দিয়ে চলেছে।

হ্যুগোর বৈশিষ্ট্যই হল অতি সাধারণ মানবের ভেতরে অতিমানবতার উন্মেষ সাধন। সামান্য সূচনা থেকে যেভাবে এর বিকাশ তিনি ফুটিয়ে তোলেন সংঘাত ও বিবর্তনের মাধ্যমে, তা শুধু মহত্তম স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। দীনতম পরিবেশের ভেতর নরদেবতার আবির্ভাব যে সচরাচরই ঘটে থাকে, তাই যেন হ্যুগো-সাহিত্যের চরম প্রতিপাদ্য। ভ্যালজঁা, গেলিয়াট, কোয়া-সিমোডো প্রভৃতি চরিত্র এই আবির্ভাবের দরুণই ধন্য হয়েছে, অমরত্ব লাভ করেছে।

লে মিজেরাবল, হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম, টয়লার্স অব দি সী, নাইনটি থ্রী, ক্রমওয়েল, লাফিংম্যান প্রভৃতি গ্রন্থ মানবজাতির চিরন্তন সম্পদে পরিণত হয়েছে। এর প্রত্যেকটি রচনাই রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ। মানুষের ভেতর যতদিন অমৃতের পিপাসা বর্তমান থাকবে, ততদিন সমাদর থাকবে এদের।

হ্যুগো শুধু উপন্যাস রচনাই করেন নি, নাটকেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অবশ্য বলিষ্ঠ আদর্শবাদের আলোক বিচ্ছুরণ করে তাঁর উপন্যাস-গুলিই অর্জন করেছে কালজয়ী প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যু হয়।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

---

(সুধীন্দ্রনাথ রাহা অনুদিত ও দেব সাহিত্য কুটির কর্তৃক মহালয়া ১৩৭৩-এ প্রকাশিত 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

## প্রকাশকের নিবেদন

উনিশ শ' ছিয়াশির উনিশে ফেব্রুয়ারী মারা যান সুধীন্দ্রনাথ রাহা।

উনিশ শ' পঁচাত্তরের পঁচিশে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন তাঁর সহধর্মিণী প্রীতিলতা রাহা।

যতদিন বেঁচেছিলেন প্রীতিলতা, নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

তাই সুধীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি।

সুধীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন সুস্পষ্টভাবে দু'ভাবে বিভক্ত। প্রথম বাইশ বছর সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গ রঙ্গালয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বাংলা নাট্য সাহিত্যে তাঁর অবদান অসাধারণ বাইশটি মঞ্চ সফল নাটক।

কিন্তু তাঁর মোট পঁয়ষট্টি বছরের সাহিত্য-জীবনের বাকীটুকু তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের অন্য একটি ধারাকে পুষ্ট করার জন্য।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ভাণ্ডার থেকে মূল্যবান রত্নগুলি তুলে এনে তিনি অনুবাদ, ভাষান্তর, রূপান্তরের মাধ্যমে এক অনন্য-কীর্তি স্থাপন করে গেছেন; বাংলা সাহিত্যে বিশ্ব সাহিত্যের ধারাটিকে প্রবাহিত করতে তিনি জীবনপাত করে গেছেন দু'শতাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে—তাই বর্তমান প্রজন্ম তাঁকে অনুবাদক রূপেই বেশী চেনে।

সুধীন্দ্রনাথের মূল পাঠক বাংলার কিশোর কিশোরীরা। বার্ধক্যে পৌঁছেও তাই পাঠক সমাজ কিশোর সাহিত্যিক সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর রচনার মধ্যে পেতে চান।

সুধীন্দ্রনাথ-প্রীতিলতা রাহা স্মৃতিরক্ষা কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাই দু'বছর দু'জন নাট্যকার ও দু'জন অনুবাদ-সাহিত্যিককে সুধীন্দ্র-প্রীতি স্মৃতি পদক দিয়ে সম্বর্ধনা জানিয়েছে।

কমিটির অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সাহিত্য প্রকাশনা।

স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'গৌড়ভুজঙ্গ-কণ্ঠহার' —কিশোরদের জন্য একটি এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। রচয়িতা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান অম্বরীষ। মহালয়া ১৩৯৫; অক্টোবর ১৯৮৮তে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

'এক বৃদ্ধ ও তিন শিশুর গল্প' আমাদের প্রকাশনার দ্বিতীয় গ্রন্থ।

ফরাসী বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে রাজতন্ত্রকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণতন্ত্র। সেই মহান বিপ্লবের দু'শ' বছর পূর্ণ হচ্ছে ১৯৮৯-এ। সেই উপলক্ষে এই গ্রন্থটির প্রকাশ।

বিশ্ব সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের অন্যতম ভিক্টর মারি হ্যুগো রচনা করেন নাইনটি-থ্রি (১৮৭৩)। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই—চার বছরের মধ্যেই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে শুরু হয়ে যায় এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ—রাজতন্ত্রী এবং সাধারণতন্ত্রীদের মরণপণ লড়াই—তারই পটভূমিতে হ্যুগো রচনা করেন এই অমর গ্রন্থ নাইনটি-থ্রি। সেই নাইনটি-থ্রি অবলম্বনেই অম্বরীষ রচনা করেছেন 'এক বৃদ্ধ ও তিন শিশুর গল্প'।

'নাইনটি-থ্রি' একটি সুবৃহৎ উপন্যাস। কিশোরদের উপযোগী করে রচনা করতে গিয়ে স্বভাবতই অনেক চরিত্র ও ঘটনাকে বাদ দিয়ে মূল ভাবটিকে সঠিক রেখে গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে।

হ্যুগো তাঁর সব রচনাতেই মানবতাবাদকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। নাইনটি-থ্রিও তার ব্যতিক্রম নয়। 'এক বৃদ্ধ ও তিন শিশুর গল্পে'ও শ্রীমান অম্বরীষ হ্যুগোর সেই আদর্শকেই মূল সুর রেখে গ্রন্থটির বিন্যাস ঘটিয়েছেন।

যাঁরা পড়বেন বইটি তাঁদের আনন্দ দিতে পারলেই আমাদের সকলের শ্রম সার্থক হবে।

যাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে বইটি প্রকাশিত হতে পারত না তাঁদের নামোল্লেখ করার অর্থ তাঁদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতাকে ছোট করা।

১লা জানুয়ারি, ১৯৮৯

সুখেন্দ্রনাথ রাহা

## এক

লা-সৌদ্রে। না, ছাপার ভুল নয়। জায়গাটার নাম লা-সৌদ্রে।

ফরাসী দেশ। তারই একটা প্রদেশ ব্রিট্যানী। সেই ব্রিট্যানীরই একটা বিশাল অঞ্চল জুড়ে বিরাজ করছে এক ভয়াবহ অরণ্যানী—লা-সৌদ্রে।

সময়টা আঠেরশ' শতকের শেষ দশক। সালটা সতেরশ' তিরানব্বই।

চারবছর আগে সতেরশ' উননব্বই সালে ফরাসীদেশে এক বিরাট বিপ্লব হয়ে গেছে। রাজতন্ত্র অবস্থত। রাজা ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদ ঘটেছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাধারণতন্ত্র।

কিন্তু তিনবছর বাদে! সতেরশ' বিরানব্বই খৃষ্টাব্দে ব্রিট্যানীতে রাজতন্ত্রের পক্ষে সাধারণতন্ত্রের বিপক্ষে হঠাৎই জ্বলে উঠল আগুন। সেই আগুনের তাতে তিরানব্বই সালে ব্রিট্যানীর ভেণ্ডির কৃষক-শ্রমিকরা সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করল সাধারণতন্ত্র ধ্বংসের উদ্দেশ্যে। বেধে গেল গৃহযুদ্ধ। বিদেশীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ, সে আলাদা। আর নিজের দেশের মানুষকে যখন নিজের দেশেরই মানুষ রাজনৈতিক কারণে হত্যার নেশায় মেতে ওঠে, পথে পথে—ঘরে ঘরে চলে স্বদেশ-বাসীদের সঙ্গে স্বদেশবাসীর জীবনপণ লড়াই—গৃহযুদ্ধ তারই নাম। এর থেকে ভয়ঙ্কর বুঝি আর কিছু নেই। তা এই সতেরশ' তিরানব্বই-এ ব্রিট্যানীতে ভেণ্ডির কৃষক-শ্রমিকরা নেমে পড়ল সেই ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী লড়াইএ। আর সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের হরেকরকম পাপকর্মের জায়গা হচ্ছে এই অরণ্য—লা-সৌদ্রের অরণ্য।

কতদূর যে এর বিস্তৃতি কে জানে! বার্চ, বীচ আর ওক গাছের বন। জঙ্গল এতো ঘন যে কখনোই আলোর দীপ্তি সে অরণ্যে দেখা

যায় না। সদাই গোধূলির আধো আলো সে অরণ্যে। তাই সমতল মাটিতে জমে উঠেছে শ্যাওলা আর ঘাসের আস্তরণ। আকাশ ছোঁয়া গাছের তলায় সুনিবিড় ঝোপঝাড়।

পথ! পথ নেই। কোথাও যদিবা একটুখানি পায়ে চলার পথের নিশানা দেখা যায় পরক্ষণেই সেটা যায় হারিয়ে কাঁটাঝোপের আড়ালে।

সমস্ত জঙ্গলটা জুড়ে কেমন একটা গা ছমছমে নির্জনতা। সবাই যেন পরিত্যাগ করে গেছে এই ভয়াবহ অরণ্যকে। কেবল প্রকৃতির আপন খেয়ালে ফুটে রয়েছে অজস্র বনফুল; আকাশ থেকে নেমে এসেছে শিশির, ভিজিয়ে রেখে গেছে গাছের পাতা; গাছের ডালে পাখির কলকাকলি। জঙ্গলটা যে পৃথিবীরই একটা অংশ এগুলো না থাকলে সেটাও বোঝার সাধ্যি নেই। এমনই একটা ভীতিবিহ্বল পরিবেশ।

মানুষ! আছে কিংবা নেই! কিন্তু ছিল। কেননা চিহ্ন কোথাও কোথাও পাওয়াও যায়। কোনো জায়গায় মাটিটা হয়তো পোড়া, কোথাও বা ঘাসগুলো মানুষের পায়ের চাপে দলিত, কোনো গাছের ডালে হয়তো বা একটু শুকনো রক্তের দাগ। তার অর্থ মানুষ ছিল। কিন্তু এখন কি আছে? থাকলে কোথায়? কোন ঝোপের আড়ালে? কোন গাছের ডালে? আর যদি থেকেই থাকে তাহলে এই রকম দমচাপা নিস্তব্ধতা কেন? কেন এতো নির্জনতা?

চারপাশের এই পরিবেশ একত্রিশটা মানুষকে আরো সতর্ক করে তুলল। বন্দুকগুলো উদ্যত, চোখের নজর প্রত্যেকেরই তীক্ষ্ণ, কান প্রত্যেকের খাড়া। না, ব্যস্ত কেউ নয়। কিন্তু একাগ্নী বাণের মতোই তাদের উদ্দেশ্যে তারা একাগ্র।

বিশাল একজোড়া গোঁফ, একজোড়া ঝাঁকড়া ভুরু আর জ্বলন্ত কয়লার মতো একজোড়া চোখ; এগুলোর মালিক ব্যক্তিটি পদে একজন সার্জেণ্ট। তাঁর অধীনে তিরিশজন সৈনিক। মোট এই

একত্রিশজন মানুষ এই মুহূর্তে লা-সৌদ্রের ভয়াবহ অরণ্যে চিতাবাঘের বুদ্ধি আর সিংহের পরাক্রম নিয়ে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানোর মতো তন্নতন্ন করে জঙ্গলটা খুঁজে ফিরছে।

এরা সাধারণতন্ত্রের সৈন্যদল। ভেণ্ডির বিদ্রোহীদের দমনের জন্য একেবারে প্যারী নগরী থেকে এসেছে। পলাতক বিদ্রোহী, রাজতন্ত্রের পক্ষের লোকদের এই জঙ্গল থেকে খুঁজে বার করতে হবে। সময়টা মে মাসের শেষাশেষি—সতেরশ' তিরানব্বই সাল।

পোড় খাওয়া সৈনিকের দল। মানুষ দেখা যাচ্ছে না—ভৌতিক নির্জনতা—সুতরাং আরো সতর্ক হও! কে জানে দূরে বা কাছে কোন আড়ালে হয়তো বা উদ্যত হয়ে রয়েছে শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্র!

সার্জেন্ট আগে, পিছু পিছু তিরিশজন সৈনিক। কিন্তু কোথাও একটা পাতাও তো নড়ে না, কোথাও তো একটা ফল পড়ার শব্দও নেই! মৃত্যুপুরীর গুহায় ঢুকে পড়ল নাকি সবাই! সাবধান হল সকলে দ্বিগুণ।

হঠাৎ! হঠাৎই! কিন্তু একতালেই—একত্রিশ জোড়া কান একসঙ্গে খাড়া হয়ে উঠল, একত্রিশ জোড়া চোখে চোখে নিমেষে সংকেত খেলে গেল, একত্রিশটা বন্দুকের ঘোড়ায় একসঙ্গে একত্রিশটা আঙুল চেপে বসল।

একটা ঝোপ। আর ঝোপের আড়ালে অতি মৃদু, প্রায় নিঃশব্দ, কিন্তু নিঃশ্বাস। একে শব্দ বলা যায় কি? যাক বা না যাক, নিঃশ্বাস যখন—তখন—! চোখের পলকে ঝোপটাকে ঘিরে ফেলল একত্রিশজন সৈনিক, তিরিশজন কেবল উৎকর্ণ—সার্জেন্টের হেঁকে ওঠার অপেক্ষায়। তাঁর একটা হুকুম কেবল 'ফায়ার!'

কিন্তু না। সার্জেন্ট হুকুম দিলেন না, তার পরিবর্তে—সবাইকে চমকে দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন ঝোপটার মধ্যে। সৈনিকরা বুঝিবা হতচকিত হয়েছিল—কিন্তু সেকেণ্ডের জন্য—মুহূর্তের মধ্যেই তারাও ঝাঁপ দিল ঝোপটাকে লক্ষ্য করে।

বসে আছে এক মা···পৃষ্ঠা-৫

এবং যা খুঁজছিল তারা। মানুষ—!

মানুষ!

হ্যাঁ! আছে। অবশ্যই আছে লোক সেখানে।

একজন না, দু'জন না, একেবারে চার-চারজন।

ডাল-পাতায় নিবিড় করে ঘেরা একটুখানি জায়গায় শ্যাওলার উপর বসে আছে—

বসে আছে এক মা।

কোলে তার এই এত্তটুকুন একটা শিশু। মায়ের জানুতে মাথা রেখে আরো দু'টি শিশু। অঘোর ঘুমে ঘুমিয়ে আছে।

এই শত্রু! এদের ভয়ে এতো সতর্কতা! এদের মারতে একত্রিশটা বন্দুকের নল উদ্যত!

পর্বতের মূষিক প্রসব! এতো সতর্কতা—শত্রু নিধনের এতো ব্যগ্রতা, দুর্দম সাহসিকতা, সজাগ প্রহরা, চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা, সিংহের পরাক্রম, উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্ন্যুদগীরণের প্রতীক্ষা—তার এরকম একটা লজ্জাজনক পরিণতিতে সার্জেণ্ট বুঝিবা একটু অপ্রতিভ! তাই স্বাভাবিকতার থেকে অনেক বেশী জোর দিয়েই হেঁকে ওঠেন,—'কে তুমি? এখানে কি করছ?'

উত্তর নেই। মায়ের মাথাটা কেবল একটু সোজা হল।

—পাগল নাকি তুমি? এখানে এইভাবে বসে আছ? এখুনি তো গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে। বুদ্ধু কাঁহিকা।' সার্জেণ্টের গলার স্বর আরো কর্কশ।

এ কি মানবী না পাথর! বজ্রাহতের মতো নিস্পন্দ। শরীরের মধ্যে কেবল চোখ দু'টি তাকিয়ে আছে জীবনের চিহ্ন নিয়ে। আর সেই বিস্ফারিত চোখে ভীতি, বিহ্বলতা, বিস্ময়, হতবুদ্ধি। তার চোখের তারায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে চারপাশের অপরিচিত হিংস্র মুখগুলো, তাদের বন্দুক, তরবারি, সঙ্গীন।

সার্জেণ্টের গলার স্বরে, সৈনিকের পায়ের আওয়াজে জেগে উঠেছে

ঘুমন্ত বাচ্ছা দু'টি। একজন বলে উঠল, 'মা। খিদে পেয়েছে', আরেকজন কেঁদেই ফেলল, 'মা। ভয় করছে।'

কিন্তু মাও যে ভীতা-সন্ত্রস্তা। হতবাক। কিসের ভরসায় সে সান্ত্বনা দেবে ছোট্ট শিশুদের !

সার্জেণ্টই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—'না। না। ভয় কি ? আমরা তো লাল টুপির পল্টন।'

বললেন বটে ; কিন্তু নিজেও তো তিনি জানেন না তাঁর ঐ বিশাল একজোড়া গোঁফ, ঐ ঝাঁকড়া ভুরু, ঐ ভাটার মতো চোখই এই অভাগিনী মাকে কি বিষম ভয়ে কাঁপিয়ে তুলেছে !

ব্রিট্যানী প্রদেশের কৃষক রমণীর পোশাক এই নারীর। জুতো নেই, পা কেটে ক্ষতবিক্ষত ; রক্ত ঝরছে এখনো।

তার আপাদমস্তক লাল চোখ দু'টো দিয়ে একবার ভালো করে দেখলেন সার্জেণ্ট। নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠলেন 'ভিখিরি একেবারে ভিখিরি !' সামান্যক্ষণ চুপ করে থেকে একটু উচ্চকণ্ঠেই এবার জিজ্ঞাসা করলেন—'তোমার নাম কি ?'

ভয়ে আধবোজা গলায় একটা উত্তর এল, 'মিচেল ফ্লেচার্ড।'

—রাজনৈতিক মতামত ?

একটা হতচকিত নীরব মুখ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দেখে সার্জেণ্ট আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

—আমার কথাটা কি শুনতে পেয়েছ ?

এবার একটা উত্তর এল, থেমে থেমে। কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত।

—আমি যখন খুব ছোট, তখনই আমাকে মঠে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি সন্ন্যাসিনী নই। আমার বিয়ে হয়েছে। গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল, তাই এতো তাড়াতাড়ি পালাতে হল যে জুতো পরার সময় পাইনি।'

—যাচ্চলে। কি জিজ্ঞাসা করলাম আর কি উত্তর ! বলি— তোমার রাজনৈতিক মতামতটা কি ?

—কি বলছ-কিছুই বুঝতে পারছি না।

—অনেক মেয়ে গুপ্তচর আছে। ধরতে পারলে তাদের গুলি করে মারি আমরা। ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

তিন শিশুর জননীর চোখে নির্বোধের ভাব। কোনো কথাই ওর মাথায় ঢুকছে না যেন।

—তুমি কি বেদে ?

কোনো জবাব নেই।

—তুমি কোন দলে ?

অন্য পক্ষে কোনো কথা নেই।

—কি আশ্চর্য ! তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছ না ? তুমি কোন দলে ?—সার্জেণ্টের গলায় যেন হুঙ্কার।

—আমি জানি না—ভয়ে ভয়ে উত্তর।

—কি রকম ? নিজের দেশের কথা জান না ?

—দেশ ! হ্যাঁ—দেশ তো জানি।

—কোথায় তোমার দেশ ?

—আজে গ্রামে সিঙ্কোনারের গোলাবাড়ি।

নাঃ। সার্জেণ্টেরই সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এ মেয়ে দেশ বলতে কি বোঝে !

সার্জেণ্ট আবার একটু নীরব থেকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—সিঙ্কোনার ?

—হ্যাঁ। সিঙ্কোনার।

—কিন্তু সিঙ্কোনার তো কোনো দেশ নয়।

—আমার দেশ সিঙ্কোনার।

সার্জেণ্ট প্রায় নাজেহাল। শেষ পর্যন্ত তাই বললেন,

—বেশ বাবা বেশ। তা তোমার বাড়ির লোকজনেরা কি সব ঐখানেই থাকে ?

—থাকে।

—কি করে তারা ?

—সব মরে গেছে। খালি আমি একাই বেঁচে আছি।

ভিতরে ভিতরে সার্জেন্ট দমে যাচ্ছেন। প্রশ্নের কোনো সূত্র পাচ্ছেন না। ভেবে চিন্তে তাই শেষে জিজ্ঞাসা করলেন আবার,

—তোমার কোলের এই বাচ্ছাটি—কি নাম ওর ?

—জর্জেট।

—আর এই বুঝি বড় ছেলে ? বাঃ এতো দেখি মস্ত হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে করেই সার্জেন্ট মস্ত শব্দটার উপর যেন জোর দিলেন।

—কে রিনি ? হ্যাঁ।—মায়ের জবাব কিন্তু নীরস।

—আর এই বুঝি ছোট ?

—গ্র-এলা।

না। উত্তরে একটিও বাড়তি শব্দ নেই। তবু সার্জেন্ট কথা বন্ধ করলেন না।

—ঘর বাড়ি আছে ?

—ছিল।

—কোথায় ?

—আজে গ্রামে।

—তাহলে বাড়ি ছেড়ে এভাবে বনের মধ্যে বসে আছ কেন ?

—পুড়িয়ে দিল যে।

—কারা ?

—যুদ্ধ হল যে—।

—কোথা থেকে এলে তুমি ?

—ঐ সেখান থেকেই।

—কোথায় যাবে ?

—জানি না।

—ঠিক করে জবাব দাও। তুমি কে ?

—কি জানি ?

—এ আবার কি কথা ? তুমি জান না তুমি কে ?

—পালিয়ে যাচ্ছি—এই টুকুই কেবল জানি।

—কোন দলের লোক তুমি ?

—কি জানি ?

—নীল দল না সাদা দল—কাদের সাথে থাক ?

—আমি আমার ছেলেমেয়েদের সাথে থাকি।

—কিন্তু তোমার বাপ-মা ? দেখ সোজা-সত্যি উত্তর দাও। তোমার বাবা-মার পরিচয় দাও।

—তাদের নাম ছিল ফ্লেচার্ড।

—কি কাজ করত ?

—মজুরি।

—তোমার স্বামী ? তোমার স্বামী কি করত ?

—যুদ্ধ।

—যুদ্ধ! কার জন্য ?

—রাজার জন্য।

—তারপর ?

—তারপর তাকে মেরে ফেলল।

—মেরে ফেলল ?

—হ্যাঁ। একটা বেড়ার ধারে।

—কবে ?

—তিন দিন আগে।

—কে মারল তোমার স্বামীকে ?

—একটা গুলি।

—গুলি ?? কে—কে করল গুলি ? সাদা না নীল ?

—সে—একটা গুলি।

—তোমার স্বামীকে কে মেরে ফেলল তুমি তাও জান না ? আশ্চর্য !

—জানি না।

—ওঃ। তা স্বামী মারা যাবার পর তুমি কি করছ?

—ছেলেমেয়েদের নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

—কোথায়?

—যেদিকে দু'-চোখ যায়।

—ঘুমোও কোথায়?

—মাটিতে।

—খাও কি?

—কিছু না।

এ কথায় সার্জেণ্ট বিস্ময়ে হতবাক। বোধকরি বুকের মধ্যে একটা ব্যথা টন্‌টন্ করে উঠল। সেটা চাপা দেওয়ার জন্যই এমন মুখভঙ্গি করলেন যে তাঁর বিশাল গোঁফ জোড়া ঝুলে পড়ল। একটু থেমে থেমেই তাই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—

—কিচ্ছু খাও না?

—লতা-পাতা।

বড় ছেলেটি এতক্ষণের কথাবার্তায় কি বুঝল কে জানে! হঠাৎই বলে বসল, 'আমার খিদে পেয়েছে মা।'

সার্জেণ্ট তাড়াতাড়ি এক টুকরো রুটি বের করে মায়ের হাতে দিলেন। মা দু' ভাগ করে দিতেই ছেলে দু'টি গোগ্রাসে রুটির টুকরো দু'টো মুখে পুরতে থাকল।

সেদিকে সার্জেণ্ট একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

—তাহলে তুমি পালাচ্ছ?

—কি করব?

—কোন দিকে পালাচ্ছ?

—যে দিকে পথ চোখে পড়বে, বন-বাদাড়, মাঠ।—যে দিকেই হোক সে দিকেই।

—সে দিকেই ?

—সে দিকেই। প্রথমে দৌড়োই, তারপরে হাঁটি, তারপরে আছাড় খাই।

—বেচারি !

—লোকগুলো যুদ্ধ করছে। কেবল যুদ্ধ করছে। আমার চারপাশে এতো গোলাগুলি এসে পড়ে ! ওরা কি চায় ?

অসহায় নারীর এই প্রশ্ন, কি উত্তর দেবেন সার্জেণ্ট ? মনে মনে বিচলিত, বেশ বিচলিত হয়ে উঠলেন তিনি।

নারীটি কিন্তু নীরব নয়। নিজের মনেই সে বলে চলেছে—

—ওরা কি চায় ? কি চায় ওরা ? বুঝতে পারি না, কিছু বুঝতে পারি না ; কেবল বুঝতে পারি ওরা আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে, গুলি করে মেরে ফেলেছে।

সার্জেণ্ট ! এতো অভিজ্ঞতা ! কিন্তু ওরকম প্রশ্নের জবাব কি দেবেন তিনি ? আরো বিচলিত হয়ে উঠলেন সার্জেণ্ট। মনের মধ্যে তাঁরও বিক্ষোভ, আর সেই বিক্ষোভটা ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল বন্দুকের কুঁদোর মধ্য দিয়ে। সশব্দে তাই বন্দুকের কুঁদোটা আঘাত করল মাটিকে। সার্জেণ্টের গলায় আবেগের সুর—

—এই যুদ্ধ ! এই যুদ্ধ একটা নারকীয় ব্যাপার !

রমণী আপন মনে কথা বলেই চলেছে।

—কাল রাতে ঘুমিয়েছি একটা গাছের ফোকরে।

—সে কি ? এই চারজনে ?—সার্জেণ্ট বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন।

—হ্যাঁ। চারজনেই।

—ঘুমিয়েছিলে ?

—ঘুমিয়েছি। না ঘুমিয়ে করব কি ?

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়েছ ?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস শোনা গেল রমণীর।

—বরাত ভালো—গরমের রাত।

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস। চোখে তার হতাশার অন্ধকার; নীরবে বিমূঢ়া মা মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ধীরে ধীরে নিথর হয়ে গেল।

চারপাশ থেকে একটা কঠিন পরিবেশ তাকে ঘিরে ফেলেছে। দৈন্য তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে। সদ্য স্বামীহারা; রিক্তা। কোলে তিনটি অবোধ শিশু, অনাথ। পলায়ন, নির্জনবাস, অস্ত্রের ঝনঝনানি, আগ্নেয়াস্ত্রের অগ্ন্যুৎপাত, ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর ছোবল, খিদে, তেষ্টা, কখনো সামান্য বনজ ফলাহার, অধিকাংশ সময়ে অনাহার, আশ্রয় বলতে পায়ের তলায় লা সৌদ্রের শ্যাওলা ধরা মাটি আর মাথার উপর অসীম শূন্য।

রমণী নিথর। শরীর তার নিস্পন্দ।—লাল পল্টনের সৈনিকরাও নির্বাক হয়ে গেছে। চারটি প্রাণীর অসহায়তা তাদের মাথাগুলোকে আর খাড়া রাখতে দিচ্ছে না। ধীরে ধীরে তাদের দৃষ্টিও মাটির দিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল।

সবচেয়ে ছোট্ট শিশুটি, মায়ের কোলে শুয়ে থাকা শিশুটির সুন্দর নীল চোখ দু'টি আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে সার্জেণ্টের বিশাল মুখটার উপর গিয়ে পড়ল।

সার্জেণ্টের বিশাল ভাটার মতো চোখ দু'টোও তো সেদিকেই তাকিয়ে।

—সার্জেন্ট বিস্মিত। সার্জেণ্ট আপ্লুত। এ—এ কি! ও—ও যে আবার হাসে!

বিশাল গোঁফ, ঝাঁকড়া ভুরু, আগুন-গোলা চোখের মালিক ঐ ভয়াবহ মুখের সার্জেণ্ট—বুকের মধ্যে তাঁর যেন কি একটা বিঁধে গেল; ভালোবাসার-স্নেহের আবেদন কি এরকম শলাকার মতো বিদ্ধ করে!

পাথর নিঙ্ড়ে দু' ফোঁটা জল নেমে এল। প্রথমে চোখ, তারপর গাল, তারপর গোঁফ; চোখের জল বিশাল গোঁফজোড়াকে ভিজিয়ে

দিচ্ছে। চোখের জলে সার্জেণ্টের দৃষ্টি অস্বচ্ছ, কিন্তু মুখটা উদ্ভাসিত। তিনি মাথা নীচু করে শিশুটিকে দেখতে থাকেন, দেখতেই থাকেন।

তারপর—হঠাৎ গলার পর্দা তুলে মাথা উঁচু করে তিনি বলে উঠলেন—

—সাথী ভাই সব। দেখে শুনে মনে হচ্ছে এই অনাথ শিশুদের লালন পালনের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। কি বল তোমরা? ওরা আজ থেকে হোক আমাদেরই সন্তান।

একটা উল্লাস। সহর্ষে সৈনিকরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

বন্দুকটা নামিয়ে রেখে সার্জেণ্ট তাঁর দু'হাত প্রসারিত করে ধরলেন মা আর তার তিন শিশুর উপরে। বলে উঠলেন—

—তাহলে তাই ঠিক হল। দেখ সবাই—আজ থেকে এরা হল লালটুপি-পল্টনের সন্তান।

—জয়, সাধারণতন্ত্রের জয়।

চেঁচিয়ে উঠল লাল-টুপি পল্টনের একত্রিশটা গলা।

## দুই

ক্রুদ্ধ কুকুর তার প্রভুর গলায় শান্ত হয়, ধাবমান ষাঁড় বাধা পেলে থমকে দাঁড়ায়, অজগরকেও মন্ত্রমুগ্ধ করা যায়, ভয় দেখানো যায় বাঘকে, পরাস্ত করা যায় পশুরাজকেও, পাগলা হাতিও পরাভূত হয়।

প্রবল ঝড় উঠলে সে একসময়ে থামে, ঘূর্ণিবায়ু ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়, মাস্তুল ভাঙলে সারানো যায়, জাহাজে ফুটো দেখা দিলে তার মেরামত চলে, আগুন লাগলে তাকে নেভানো যেতে পারে। কিন্তু—

কিন্তু যদি কোনো জড় পদার্থ হঠাৎ দানব হয়ে ওঠে, যদি তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয় তাহলে? যদি হাজারটা বজ্রের শক্তি একটা

কামানের নলে ঢুকিয়ে বন্দী করে রাখা হয় তখন যে অতিকায় জড়রাক্ষস তৈরী হয় তাকে তো নিধন করা যায় না।

সমুদ্রে জাহাজের অনেক বিপদ। কিন্তু সব থেকে ভয়ঙ্কর হচ্ছে জাহাজের ভিতরে থাকা শৃঙ্খলাবদ্ধ নিরীহ কামান।

যতক্ষণ কামান শেকলে আবদ্ধ, যতক্ষণ না তাতে বারুদ ঠেসে গোলন্দাজ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে ততক্ষণ সবদিক দিয়েই সে নিরীহ, প্রাণহীন।

কিন্তু কোনো কারণে যদি সেই কামান, যার ওজন দশহাজার পাউণ্ড, দ্রুত ধাবমান জাহাজের মধ্যে শেকল ভেঙে ফেলে তাহলে—?

তাহলে তার থেকে মারাত্মক কিছু আর নেই। এক জড়, নিরীহ পদার্থ—মুহূর্তে শতেক প্রাণ নিয়ে হাজারো দৈত্যের শক্তিতে এক প্রবল রাক্ষসে পরিণত হয়।

সমুদ্রকে গতিশীল করে বাতাস, সমুদ্রের গতিতে চলে জাহাজ আর সেই চলমান জাহাজ ঢেউয়ের তালে তালে ওঠে, নামে, কখনোও কাত হয়, কখনো লাফায়, আর শৃঙ্খলচ্যুত কামান তখন আপন ইচ্ছায় দ্রুত ধাবমান। জাহাজের দোলায় সে দোলে, ওঠে, নামে, লাফায়, কাত হয়, ছুটে বেড়ায়।

যতক্ষণ তার পায়ে শেকল ততক্ষণ সে মানুষের হাতের পুতুল, যেই শেকল ছিঁড়ল সে পরিণত হল হিংস্রতম আদিম জান্তব শক্তিতে। তখন সে অদম্য, অবধ্য। কোনো এক অপার্থিব দানবিক শক্তিতে সে জীবন্ত হয়ে ওঠে। নিজের দু'টো চাকার উপর ভর করে সে আপন ইচ্ছায় চলে। গতি তার তীরের থেকেও তীব্র, শক্তিতে সে সহস্র হস্তির থেকেও বেশী। কখনো সে ধেয়ে চলে, কখনো সে পিছনে ছুটে আসে, কখনো একটু ধীর থেকেই পরক্ষণেই ত্রিগুণবেগে জাহাজের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে চলে ; কখনো কোনাকুনি, কখনো সোজা, কখনো আড়াআড়ি কখনো আবার আপন চাকার উপর ভর

দিয়ে সে লাট্টুর মতো ঘুরতে থাকে। কখনো লাফ দেয়, কখনো সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন তার আচরণকে কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা করা যায় না। তখন উদ্দেশ্য তার একটাই—ভেঙে চুরে সব তছনছ করে দাও, ধ্বংস কর, ধ্বংস—ধ্বংস।

এই রকম একটি লৌহদানব, ওজন যার দশহাজার পাউণ্ড, ছুটছে যখন, তখন বুঝি হরিণের মতো হালকা ; লাফাচ্ছে যখন, তখন যেন শিশুর হাতের একটা ছোট্ট বল ; কিন্তু আছড়ে পড়ছে যখন, তখন সে সমুদ্রতরঙ্গ ; স্পর্শে তার বিদ্যুতের ঝলকানি, বধির কবরের মতো এর ভার।

একে কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?

এ যে নিজে নিজেই গতি পরিবর্তন করে, উন্মাদের মতো আচরণ, কিন্তু প্রতিআক্রমণকে এমন সহজে এড়িয়ে যায় যেন মহা ধুরন্ধর।

এ ধরনের শৃঙ্খলহীন উন্মত্ত একটা দানব, আসলে যে নিরীহ একটি কামান, এখন তার প্রতিটি আক্রমণে জাহাজের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠছে, কখন যে কোথায় এর আঘাতের চাঁদমারি তা কে জানে ? বহু যুদ্ধের পরিণত রণনায়কের মতো বুদ্ধিধর আক্রমণ এর—কখনো বাঁয়ে আঘাত করছে, কখনো ডাইনে, কখনো সামনে, কখনো বা পিছনে। আঘাত করতে জানে, আক্রান্তকে পালাতে দেয় না ; নিজে কিন্তু অপ্রতিহত।

এ এক কালান্তক শত্রু। এ শত্রুর আবির্ভাব ঘটলে ঈশ্বরে ঘোর অবিশ্বাসী মানুষেরও ঈশ্বরকে ডাকার কথা মনে হয়।

ক্লেমোর জাহাজে এই শত্রুই জেগে উঠেছে।

দোষটা গোলন্দাজদের যে প্রধান, তারই। শেকলের স্ক্রু ঠিকমতো আটকায়নি সে ; ফলে জাহাজের দোলায় দোলায় কখন সেই শেকল গেছে খুলে এবং—। এবং দশহাজার পাউণ্ডের একটি কামান শৃঙ্খল-মুক্ত হয়ে জাহাজটাকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে

লাফাচ্ছে, দৌড়োচ্ছে, আঘাত করছে আর জাহাজটি প্রতিটি আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে। মাস্তুলগুলো ভেঙেচুরে তছনছ, জাহাজের দু'পাশে ফাটল ; মৃত্যু যেন সমুদ্রের লোনা জল হয়ে ঢুকছে তীরবেগে, জাহাজের খোল ভরে উঠছে।

আর সামান্য সময়, জাহাজ ডুববে। হয় মরণ খেলার অবসান ঘটাতে হবে, নয় মরণেই হবে খেলা শেষ।

ক্লেমোর জাহাজে মহাবিপদ আসন্ন।

* * *

সতেরশ' তিরানব্বই খৃষ্টাব্দের পয়লা জুন।

ইংলিশ প্রণালীর মধ্যবর্তী একটি দ্বীপ—নাম তার জার্সি। তারই নিভৃত বন্দর থেকে পাল তুলে যাত্রা করল একটি জাহাজ—ক্লেমোর।

বার-সমুদ্র তখন কুয়াশাচ্ছন্ন।

জাহাজটা ইংরেজ নৌবাহিনীর। কিন্তু নাবিকেরা সবাই ফরাসী। এরা সকলেই সাধারণতন্ত্রবিরোধী। সাধারণতন্ত্র থেকে মুক্ত হতে সবাই পলাতক। জাহাজে যেমন অসংখ্য নাবিক আছে দক্ষ, তেমনি সৈনিক আছে অজস্র অসমসাহসী। সকলেই পরীক্ষিত রাজতন্ত্র-পক্ষীয়।

কাউন্ট দ্য বয়বার্থেলো ক্লেমোর জাহাজের কাপ্তেন হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। ফরাসী রাজতন্ত্রের আমলে রাজকীয় নৌবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং দেশের সর্বোচ্চ সম্মান—সেণ্ট লুই ক্রশ পাওয়া মানুষ তিনি। তাঁর সহকারী হয়ে এসেছেন ফরাসী বাহিনীর একজন প্রাক্তন সৈন্যাধ্যক্ষ শিভালিয়ের দ্য ভিউভিল।

ক্লেমোর দর্শনে নিরীহ—সামান্য একটি বাণিজ্যপোত মাত্র। কিন্তু নীচের ডেকে লুকনো রয়েছে লোহার শেকলে বাঁধা তিরিশ-তিরিশটা কামান। কোনোভাবে স্থানচ্যুত যেন না হয় তার জন্য ভালোভাবে

বেঁধে রাখা হয়েছে লোহার শেকল দিয়ে। আর লোকচক্ষুর যাতে আড়ালে থাকে তাই ডেকের চারপাশ সযত্নে ঢাকা।

সুতরাং চেহারায় যাই হোক না কেন, উদ্দেশ্য যে জাহাজটির অন্যরকম তা প্রথম থেকেই বোঝা যায়।

তা উদ্দেশ্যটা কি ?

ষোড়শ লুইয়ের শিরচ্ছেদ হওয়ার পর শিশুপুত্রটি তখনো কারাগারে। রাজতন্ত্র সমর্থন করেন যাঁরা তাঁরা চাইছেন নির্বাসিত রাজবংশীয়দের মধ্যে অন্য কাউকে আপাতত সিংহাসনে বসাতে যাতে সাধারণতন্ত্রের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। করা যায় রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। রাজতন্ত্রসেবীদের মধ্যেই একটি দল সশস্ত্র সৈনিকদের নিয়ে এই জাহাজ ভাসিয়েছেন। সেই জাহাজই ক্লেমোর। আর সেখানেই এই শৃঙ্খলচ্যুত কামানের ধ্বংসলীলা।

কামানটা যখন শেকল ছিঁড়ল তখন ডেকে কর্মরত ছিল কয়েকজন গোলন্দাজ। কামানটা—কেউ কিছু বুঝবার আগেই সামনের চারজনকে পলকে পিষে ফেলে পঞ্চমজনের দেহটিকে ছু'টুকরো করে পাশের কামানটিকে এমন প্রবল আঘাত করল যে সেটির হল সশব্দে সলিল সমাধি।

জাহাজের ডেকে মৃদু লণ্ঠনের আলো। জাহাজের দোলায় সে আলো এক আধো অন্ধকারের ভৌতিক পরিবেশ তৈরি করেছে। কখনো কম আলোয় কালো দৈত্যের ছায়া, কখনো কালো ছায়ায় প্রতিফলিত লণ্ঠনের ম্লান আলো।

গোলন্দাজরা বিকট আর্তনাদ করে ধেয়ে চলল নিরাপদ জায়গার সন্ধানে।

উপরে ডেকে তখন বয়বার্থেলো আর ভিউভিল ফরাসী রাজনীতি এবং রণনীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন—এমনি সময়ে গোলন্দাজদের বিকট আর্তনাদ, কামানের সশব্দ পতন। তাঁরা দ্রুত নেমে আসতে গেলেন—কিন্তু পারলেন না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে গোলন্দাজরা।

তারপর দীর্ঘক্ষণ। সেই লৌহদানবের ধ্বংসলীলা অসহায়ভাবে প্রত্যক্ষ করছেন সবাই।

বয়বার্থেলো ভিউভিলকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর?'

—কখনো কখনো।

—ঝড়ের সময়ে?

—হ্যাঁ—। আর এই রকম অবস্থায়।

—ঈশ্বরই একমাত্র আমাদের বাঁচাতে পারেন।

কিন্তু না। একজন শেষ চেষ্টা করল।

সার্কাসের মরণ কূপ খেলা!

সেই মরণ কূপে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল একটি মানুষ, হাতে একটি লোহার দণ্ড আর একটি ফাঁস পরানো দড়ি। সে আর কেউ নয়—প্রধান গোলন্দাজ, যার গাফিলতিতে এই ভয়ানক বিপদ।

আত্মগ্লানিতে লোকটি ভুগছিল। তাই সিদ্ধান্ত নিল সে আত্ম-দানের। তারই অমনোযোগিতার ফলে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। নিজেকে অমার্জনীয় অপরাধী মনে করছিল সে, তাই ভাবল নিজেকে উৎসর্গ করেও যদিবা এর পরিসমাপ্তি ঘটানো যায় তো তাই যাক।

শুরু হল অসম লড়াই। জড়ের সঙ্গে বুদ্ধির, কামানের সাথে গোলন্দাজের, অচেতনের সঙ্গে চৈতন্যের।

লোকটির মনে প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গীকার, কিন্তু সে ভীত। তার মুখে বিবর্ণতা, আসন্ন সঙ্কটের আশঙ্কায় মানুষটি বিভীষিকাগ্রস্ত। কখন কামান তার পাশ দিয়ে যাবে তারই প্রতীক্ষায় রয়েছে সে।

আছে বটে অপেক্ষায়, কিন্তু তখনো সে জানে না কামানের সেই বিদ্যুৎগতি সে এড়াবে কি ভাবে! সামান্য একটু ছোঁয়া—মৃত্যু তার অবধারিত। জাহাজের সব ক'টি মানুষ রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে; চোখের পাতা ফেলতেও বুঝিবা তারা ভুলে গেছে।

সবাই সিঁড়ির অনেক উপরে। নিশ্চিত মৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে যত দূরে থাকা যায় ততোই মঙ্গল—দূর থেকে সবাই নিরীক্ষণ করছে মরণ কূপের খেলা।

না সবাই নয়।

সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক বৃদ্ধ। তিনি তুলনায় অনেক অনেক স্বাভাবিক। গোলমালের সূত্রপাত থেকেই তিনি কখন যেন এসে দাঁড়িয়ে গেছেন এখানে। নিশ্চল পাথরের কাঠিন্য তাঁর মুখে, শরীরে। তিনি নিজেও বোধকরি ভুলে গেছেন, যে কোনো মুহূর্তে তাঁর মৃত্যুদণ্ড সই করে দিতে পারে ঐ যন্ত্র-রাক্ষস।

বহুক্ষণ। বহুক্ষণ চলে গেছে। কামানে মানুষে লড়াই চলছে। অকস্মাৎ কামানটি অতর্কিত আক্রমণ করল পিছন থেকে—মানুষটি ঘুরবারও সময় পাবে না। বহুকণ্ঠে একটাই আর্তনাদ 'গেল—গেল। আর রক্ষে নেই।' ভয়ে সকলের চোখ বুজে আসে।

রক্ষা আছে! রক্ষা করলেন অকম্পিত বৃদ্ধ। কাছেই পড়ে ছিল একটি নোটের বস্তা, অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধ সেই নোটের বস্তাটি ধাবমান কামানের চাকার তলায় চালান করে দিলেন সুকৌশলে। কামান হোঁচট খেল।

গোলন্দাজটিও মুহূর্তে সচেতন হয়ে হাতের লৌহদণ্ডটি ঢুকিয়ে দিল কামানটির চাকার মধ্যে। তারপরই দানবিক শক্তিতে সে চাড় দিতে থাকল। চাড়—প্রবল চাড়। নতি স্বীকার করতে বাধ্য হল কামান। আস্তে আস্তে লৌহদানব উল্টে পড়ল।

উঃ। কি-যে আনন্দ সমবেত সৈনিক আর নাবিকদের মধ্যে। জাহাজের প্রতিটি কোণ উচ্চকিত হয়ে উঠল হাততালিতে।

* * *

ক্লেমোর তখনো জার্সি ছাড়েনি। যাত্রার প্রারম্ভিক আয়োজন সব শেষ।

জাহাজে এসে উঠলেন জার্সি দ্বীপের গভর্ণর স্বয়ং লর্ড ব্যাকারাস

এবং ইংরেজ নৌবাহিনীর প্রধান প্রিন্স দ্য অভার্ণি। ফরাসী রাজপুত্রদের গুপ্তদূত অভিজাত গিলাম্বার। গিলাম্বারের হাতে একটা ব্যাগ। তিনি পিছনে। কিন্তু এই তিনজনের সঙ্গে এলেন আরেকজন মানুষ।

মানুষটি উচ্চতায় দীর্ঘ, মাথার চুল পাকা—সুতরাং বয়েস হয়েছে। কিন্তু শরীরের গঠন বলিষ্ঠ। মুখের চেহারায় কঠোরতা। সব মিলিয়ে প্রখর ব্যক্তিত্ব। সঠিক বয়েস বলা মুস্কিল। এক ঝলক দেখলে মনে হবে বৃদ্ধ, কিন্তু দ্বিতীয়বারেই দেহের বাঁধুনি এবং শারীরিক সামর্থ্যের ইঙ্গিত চোখে পড়বেই। চাউনিতে বিদ্যুৎ। পদক্ষেপ চল্লিশের, গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব আশির। কিন্তু মানুষটির আগমনে রহস্য, আচরণে রহস্য, সঙ্গীরা সব শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ তাই, তাঁদের আগমন আরো রহস্য বাড়িয়ে তুলল ভদ্রলোক সম্পর্কে।

নীরব গাম্ভীর্যে ভদ্রলোককে নিয়ে আসা হল জাহাজের যে কেবিনটিতে, সেটি ব্যবহার করার অধিকার কেবল জাহাজের কাপ্তেনের ; কিন্তু সুসজ্জিত এই কামরাটিতেই ভদ্রলোককে পৌঁছে দিলেন জাহাজের কাপ্তেন বয়বার্থেলো স্বয়ং আর তাঁর সহকারী ভিউভিল।

আর ওদিকে ? জাহাজে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন গিলাম্বার সসম্মানে। প্রিন্স দ্য অভার্ণি তো তাঁকে ভাই বলেই সম্বোধন করলেন। লর্ড ব্যাকারাস বললেন—'জয় হোক সেনাপতির।'

রহস্য। সত্যিই রহস্য।

কে এই ব্যক্তি ?

নিজের জন্য নির্দিষ্ট কেবিনে ঢুকে ভদ্রলোক কাপ্তেন আর তাঁর সহকারীকে বললেন কয়েকটি মাত্র কথা—

—এ জাহাজে আমার পরিচয় জানেন মাত্র আপনারা দু'জনই। সেটা গোপন রাখার প্রয়োজনীয়তা কতটা আছে সেটাও নিশ্চয় আপনাদের জানা। জাহাজ যদি কামানের গোলায় উড়েও যায়—আপনাদের নীরব থাকতেই হবে।

—আমরা যতটুকু জানি, আমাদের সঙ্গে আমাদের কবরেই যাবে সেটুকুও, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—, অঙ্গীকারের মতোই উত্তর দিলেন বয়বার্থেলো।

* * *

কামানের চাকার তলায় সুকৌশলে নোটের বস্তা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এই রহস্যময় সেনাপতিই।

কামান আবার বন্দী হয়েছে। ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে বটে, কিন্তু চরম পরিণতি থেকে তো সবাই বেঁচেছে। প্রাথমিকভাবে গলতি করে ফেললেও অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে গোলন্দাজটি।

তাই বয়বার্থেলো গোলন্দাজটিকে নিয়ে বৃদ্ধের কাছে গেলেন, সসম্ভ্রম অভিবাদন করে বললেন,

—আপনার কি মনে হয় লোকটি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তাতে ওর সম্বন্ধে কিছু করা উচিত?

—হ্যাঁ কিছু করা উচিত।—সংক্ষিপ্ত উত্তর বৃদ্ধের।

—তাহলে আদেশ করুন।

—আদেশ আপনি দেবেন, আপনি জাহাজের কাপ্তেন।

—কিন্তু আপনি সেনাপতি।

কথাটা শুনে বৃদ্ধ ইঙ্গিতে গোলন্দাজটিকে কাছে ডাকলেন। লোকটি এগিয়ে এলে বৃদ্ধ বয়বার্থেলোর সামরিক পোশাকের উপর লাগানো সেণ্ট লুইয়ের ক্রশটি খুলে নিয়ে গোলন্দাজটির কুর্তায় ঝুলিয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের মধ্যে ফেটে পড়া উল্লাস। সৈনিকেরা সামরিক অভিবাদন করল। আকস্মিকতার বিহ্বলতায় গোলন্দাজটি বাকরুদ্ধ।

সেই আবেগবিহ্বল পরিবেশে বৃদ্ধের তর্জনী সোজা ইঙ্গিত করল গোলন্দাজটিকে, কণ্ঠে তাঁর তখন বজ্রের মতো অমোঘ ঘোষণা,

—সৈনিকরা, এবার এই লোকটিকে গুলি কর।

একটা পিন পড়লে তার শব্দ শোনা যাবে এমন নিস্তব্ধতা। এ কি আদেশ !!

সকলের মনের ভাব বুঝতে বোধকরি বৃদ্ধের সেকেণ্ড দুইও সময় লাগল না। আবার তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

—একটা অবহেলায় বিধ্বংসী কামান শেকল ছিঁড়ে মানুষ মেরেছে, জাহাজটাকে বিপন্ন করে তুলেছে; হয়তো জাহাজটা ডুবে যাবে। এতো বড় ক্ষতি যার অবহেলায়, তার একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু। অবশ্যই সে অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছে—তার জন্য পুরস্কারও সে পেয়েছে: সেণ্ট লুইয়ের ক্রশ, এখন তাকে পেতে হবে অপরাধের শাস্তি। অতএব একে গুলি কর।

নাবিকরা মাথা নীচু করে রয়েছে। আদেশ পেয়েও সৈনিকরা নীরব এবং তখনো অবনতমস্তক।

—সৈনিকরা। তোমাদের কর্তব্য পালন কর।—কথা তো নয় যেন ওক গাছের গুঁড়িতে কুঠারের ঘা।

গোলন্দাজটিও মাথা নত করল—তার বুকে জ্বলজ্বল করছে সেণ্ট লুইয়ের ক্রশ—সর্বোচ্চ সামরিক সম্মান।

কয়েকটি মুহূর্ত। একটা গুলির আওয়াজ। প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সমুদ্রে গুরুভার কিছু পতনের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল।

মাস্তুলে হেলান দিয়ে বৃদ্ধ তখন কি যেন এক চিন্তায় মগ্ন।

ফিসফিস করে বয়বার্থেলো ভিউভিলের কানে কানে বললেন,

—ভেণ্ডির উপযুক্ত নায়ক পাওয়া গেছে।

## তিন

রাত কাটছে। ভোরের আকাশ অস্পষ্ট সাদা হয়ে আসছে।

ক্লেমোর সমুদ্রের জলে ভেসে চলেছে সারারাত। কিন্তু এ কোন ক্লেমোর?

জার্সি বন্দর থেকে যে ক্লেমোর ছেড়েছিল আর আজকের ভোরের অস্পষ্ট আকাশে দেখা যায় যে ক্লেমোরকে তারা কি একই জাহাজ ?

মাস্তুল ভেঙে গেছে। সর্বাঙ্গে ক্ষত। রাজতন্ত্রসেবীদের যুদ্ধপোত, ভেণ্ডির বিদ্রোহের আশা ভরসা ক্লেমোর এখন বিধ্বস্ত—সারা রাত বাতাসের ইচ্ছে মতো ভেসে এসেছে। জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণের কোনো উপায়ই আর ছিল না, দিগন্তবিস্তৃত ঘন কুয়াশায় সমুদ্রের হাতের খেলনা হয়ে সে চলে এসেছে কোথায় সে নিজেই জানে না।

ধীরে ধীরে ভোর হচ্ছে।

রাতের অন্ধকার কেটে ভোরের আলো সকলেরই প্রত্যাশা জাগায়, মানুষ মাত্রেই চায় অন্ধকার সরে গিয়ে আলো আসুক ; কিন্তু এই মুহূর্তে ভাঙা-ধ্বংসস্তূপের মতো ক্লেমোরের কাছে সকালের আকাশ দেখা দিল অশুভের প্রতীক হয়ে।

এই ভোরে—ক্লেমোরের পশ্চিম সমুদ্রে তিনটি পর্বতশৃঙ্গ, আর পুবে ?

পুবে তার থেকেও ভয়ঙ্কর, তার থেকেও বিপজ্জনক—আট আটটি রণতরী। হ্যাঁ আটটি রণতরী আর তাদের মাথায় উড়ছে পতপত করে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের পতাকা।

গৃহশত্রু বহিঃশত্রুর থেকেও ভয়ানক। তার উপর একটি নয়, দু'টি নয়—একেবারে আটটি।

বয়বার্থেলো, ভিউভিল বহু অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। তাঁরা দেখেই বুঝলেন ঐ আটটি রণতরীতে কম করেও তিনশ' আশিটি কামান আছেই।

আর তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এই ক্লেমোরে ?

রওনা হবার সময়ে ছিল—তিরিশটা। কিন্তু শেকলছেঁড়া ঐ কামানের ধ্বংসলীলায় তার মধ্যে একুশটা হয় সমুদ্রের জলে লীন নয় ভেঙেচুরে অকেজো। এখন মাত্র ন'টা কামান কাজের উপযোগী।

সুতরাং একদিকে তিনশ' আশিটা কামান অন্যদিকে মাত্র ন'টি। এমতাবস্থায়—

অন্য কেউ কাপ্তেন হলে কি হত বলা যায় না। কিন্তু বয়বার্থেলো—তিনি সেণ্ট লুই ক্রশ পাওয়া সেনানী। তিনি মারতে জানেন; তার থেকেও বেশী জানেন নিজে মরে অপরকে মারতে। অতএব যুদ্ধ!

হ্যাঁ যুদ্ধ। এমনিতেও মরতে হবে অমনিতেও মরতে হবে; সেখানে প্রকৃত বীরের মতো যুদ্ধ করেই মরা ভালো, প্রতিরোধহীন ধীবরের মতো জলে ডুবে মরার জন্য তাঁর মতো সেনার জন্ম হয় নি। তিনি সমস্ত সৈনিকদের ডেকে জানিয়ে দিলেন তাঁর ইচ্ছে—সৈনিকদের কাছে তাঁর ইচ্ছেই আদেশ। সৈনিকরা প্রস্তুত হল আক্রমণ করার জন্য। হ্যাঁ—ক্লেমোরই আগে আক্রমণ করবে।

কিন্তু যুদ্ধ শুরু করার আগে বয়বার্থেলোর আরে কটা দায়িত্ব আছে, লড়াইএ প্রাণ দেওয়ার আগে সেই কর্তব্যটা তাঁকে সারতে হবে।

বয়বার্থেলো বৃদ্ধের কেবিনে এলেন। জানালেন তাঁদের সিদ্ধান্ত। —আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আমরা ঠিক করে ফেলেছি। আমাদের কবর তৈরী হয়ে গেছে, সেখান থেকে আমরা বেরোতে পারব না, বেরোতে চাইও না। মরাই আমাদের এখন একমাত্র কাজ, মরণেই আমাদের সে কাজের ইতি। কিন্তু আপনার কাজ ভিন্ন, আপনার কাজ অন্যত্র। ভেণ্ডির যুদ্ধের দায়িত্ব আপনার—সুতরাং আপনাকে বাঁচতে হবে। সেই মহৎ কর্মযজ্ঞের আপনি পুরোধা—অতএব সে কাজের জন্য আপনাকে জীবিত থাকতেই হবে। আপনি বেঁচে থাকলে রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের আশা আছে, রাজতন্ত্র আবার বেঁচে উঠবে। অতএব আপনি এক্ষুনি জাহাজ ত্যাগ করুন। একটি নৌকো এবং একজন দক্ষ নাবিক আপনাকে দিচ্ছি। এখনো আকাশ অস্পষ্ট, ঢেউ যদিও প্রবল, অন্ধকার এখনো কাটেনি—আপনার পালানো সম্ভব। আর অনেক সময়ে পালাতে পারলেই জয় সম্ভব হয়।

বয়বার্থেলোর দীর্ঘ ভাষণ শেষ হল। বৃদ্ধ কোনো কথা বললেন না,

কেবল নীরবে ঘাড় নাড়লেন। তার মানে একটাই। বয়বার্থেলোর যুক্তিতে তাঁর সমর্থন আছে।

বয়বার্থেলো আবার এলেন সৈনিক ও নাবিকদের কাছে। সঙ্গে বৃদ্ধ।

—বন্ধুরা। এই মহামান্য ব্যক্তি—ইনি রাজার প্রতিনিধি। এঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের, সুতরাং এঁকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। কেননা ফ্রান্সের রাজ-সিংহাসন রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে ইনি যাত্রা করেছেন। ইনি একজন বিখ্যাত সেনাপতি এবং ভেণ্ডির রণনায়ক রূপে নির্বাচিত। ইনি বাঁচলে সব কিছু বাঁচবে, তাই ওঁকে বাঁচানো মানে সবকিছু বাঁচানো।

—নিশ্চয়। নিশ্চয়।—সমস্বরে একটাই জবাব।

—কিন্তু আর একমুহূর্তও দেরি করা সম্ভব নয়, কে নিয়ে যাবে এঁকে? এগিয়ে এস।

কিছুক্ষণ নীরবতা। কারোর মধ্যেই চঞ্চলতা নেই। কেননা এই মৃত্যুর গুহা থেকে বৃদ্ধ সেনাপতিকে যে উদ্ধার করবে সেও তো উদ্ধার পাবে। চট করে তাই কেউ নিজের জীবন বাঁচানোর এই পথটাকে বেছে নিতে পারছিল না।

কিন্তু বয়বার্থেলো সময় দিতে রাজী নন। আবার হেঁকে উঠলেন,

—কি আশ্চর্য! কে আছ এঁকে নিয়ে যেতে পারবে—এগিয়ে এস।

অন্ধকারের মধ্যে একজন নাবিক এগিয়ে এল।

—জানতো ঐ তিনপাহাড়ের পাশ দিয়ে কূলে ওঠা খুব অসম্ভব নয়। অবশ্যই একটু ঘুরতে হবে—তবে একেবারে অসম্ভব নয়। পারবে তো?

ঘাড় নেড়ে নীরবে সম্মতি জানাল নাবিকটি।

কয়েকমিনিটের মধ্যেই একটি নৌকো ছাড়ল। আরোহী সেই বৃদ্ধ, চালক সেই অন্ধকারে এগিয়ে আসা নাবিকটি।

বাতাস এবং ঢেউ অনুকূল। যদিও তরঙ্গ উত্তাল তবুও উষার

আলোয় নৌকোটা যেন উড়েই চলল। ক্রমশ ক্লেমোর থেকে নৌকোটা গিয়ে পড়ল অনেক দূরে।

বয়বার্থেলো বোধহয় নজর রাখছিলেন। যখন মনে হল তাঁর নৌকোটি নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছেছে তখনই তিনি সমুদ্রের নিস্তব্ধতা ভেঙে বাজিয়ে দিলেন ভেরি। তাঁর বজ্রকণ্ঠ ঘোষিত হল,

—রাজভক্ত নাবিক এবং সৈনিকরা—মাস্তুলের উপর টানাও ফ্রান্স রাজতন্ত্রের বিজয় পতাকা। ঐ দেখ উদিত হচ্ছে আমাদের জীবনের শেষ সূর্য। আর দেরি নয়, দাগ কামান, চালাও গুলি, আঘাত হান শত্রুকে।

এপাশ থেকে ন'টা কামান থেকে আগুনের গোলা ছুটল।

ওপাশ থেকে প্রথম জয়ধ্বনি এল 'জয় সাধারণতন্ত্রের জয়।'

এপাশ থেকেও ধ্বনি উঠল—'জয় রাজার জয়'।

এবার পাল্টা জবাব এল—একসঙ্গে তিনশ'টা কামানের গোলা। লক্ষ্য ক্লেমোর। সমুদ্রের জল আর দিগন্ত মিলেমিশে একাকার, সেখানে একটাই রঙ্—আগুন। বিরাট এক আগ্নেয়গিরি যেন সমুদ্রের ভিতর থেকে আগুন ছড়াতে ছড়াতে উঠে এল, বন্যার মতো আগুনের স্রোত বয়ে গেল, বাতাসের গতিতে পতাকার মতো সেই আগুন ছুটতে থাকল কাছ থেকে দূরে, জাহাজের আলো ছায়ায় সে আগুন আলেয়ার মতো মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায়, মাঝে মাঝে লকলক করে ওঠে।

সেই বিরাট বাড়বাগ্নির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল ক্লেমোরের কালো কঙ্কাল।

তখন দূরে নিরাপদ সমুদ্রে ভাসমান নৌকোয় দু'জন মানুষ। নীরব।

নৌকোটা ভেসে চলেছে। ডুবো মিনকিয়ার্স পাহাড়ের গা দিয়ে অগভীর সমুদ্রের উপর দুলতে দুলতে ভেসে যাচ্ছে নৌকোটি। জোয়ার প্রবল হোক যতই, পাহাড় এখানে ডোবে না; তিনটি শৈল

শিখর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—সারি দিয়ে পাশাপাশি—যেন কোন মহাশিল্পী রচনা করেছেন এই শৈল প্রাচীর আর তার মাঝে এক সিংহদ্বার।

এই সিংহদ্বারের মধ্যে দিয়েই সুকৌশলে নৌকোটাকে নিয়ে এল নাবিকটি। এপারে অপার সমুদ্র, কালো ঢেউয়ের উপর দিনের আলো ঝকমক করছে। রণস্থল পাহাড়ের ওপাশে, কেবল কানে আসছে কামানের আওয়াজ।

সমুদ্র অপার অনন্ত। ডিঙি ভাসমান। নীরব সেনাপতি। নাবিক অবনতমস্তক।

ধীরে, খুব ধীরে অবনতমুখ তুলে নাবিকটি একবার সেনাপতিকে স্থির চোখে দেখে নিল। তারপর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল সে,—যে গোলন্দাজকে আপনি গতরাত্রে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন, আমি তার ভাই।

* * *

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মাথা তুললেন। এতক্ষণ তিনি নাবিকটিকে ভালো করে লক্ষ্য করেন নি। এবার তাকিয়ে দেখলেন। বয়স বছর তিরিশের মতো, কপালটা বাদামী, রোদে পোড়া গায়ের রঙ্। কৃষকের সরল চোখে নাবিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফলে চোখ দু'টোর চেহারাই অন্যরকম। দৃঢ় হাতে নৌকোর দাঁড়, কোমরে ছোট তরবারি, দু'টো পিস্তল। এবং গলায় একটি জপমালা। আপাত নিরীহ মানুষ।

নাবিকটির কথা যেন আগে শুনতেই পাননি বৃদ্ধ, তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

—কে তুমি?

—এই তো বললাম।

—আমার কাছে তুমি কি চাও?

নৌকোর দাঁড় তুলে রাখল নাবিকটি। তারপর হাতদু'টো বুকের উপর আড়াআড়ি করে রেখে বলল—

—হত্যা। আপনাকে হত্যা করতে চাই।

—বেশ। যা ইচ্ছে তোমার।

—তৈরী হন।—গলাটা চড়াল নাবিক।

—কিসের জন্য ?—অকম্পিত স্বর বৃদ্ধের।

—মরার জন্যে।

—কিন্তু কেন ?

এ রকমের একটা প্রশ্ন হতে পারে নাবিকটি ভাবতেও পারে নি। হত্যার হুমকি পেয়ে একজন বৃদ্ধ পাল্টা প্রশ্ন করছেন! কিছু সময়ের জন্য তার বুদ্ধিটা গুলিয়ে গেল। তারপর বলে উঠল—অনেকটা গায়ের জোরেই কথা বলা—

—বলেইছি তো আপনাকে হত্যা করতে চাই।

—আমিও তো জিজ্ঞাসা করছি, কারণটা কি ?

—কারণ আপনি আমার ভাইকে হত্যা করেছেন।—নাবিকের চোখ দু'টো ঝলসে ওঠে রাগে।

—আমি তাকে হত্যা করিনি।

—তবে কে করেছে ?

—তার নিজের অপরাধ।

নাবিকটি হাঁ। হতচকিত হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ভ্রূ দু'টি তার ক্রমশ কুটিল হয়ে উঠল। আর সেই সময়েই বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—

—কি নাম তোমার !

—হ্যামালো। কিন্তু আমার নাম শুনে তো কোনো লাভ নেই। একটু বাদেই তো ও নাম আপনাকে ভুলতে হবে যেমন ভুলতে হবে সব কিছুই।

—কেন ?

—কেননা আমার হাতে আপনার মৃত্যু অবধারিত।

নাবিক ডানহাতে পিস্তল আর গলা থেকে খুলে বাঁ হাতে জপের মালা তুলে নিল। মুখের মধ্যে হিংস্রতা।

ডান হাতে পিস্তল আর···বাঁ হাতে জপের মালা···পৃষ্ঠা-২৮

এতক্ষণে সূর্যের আলো পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। প্রভাতী সূর্যের সেই আলোর একটি ধারা এসে পড়ল নাবিকটির মুখে। বৃদ্ধ ভালো করে সেই মুখের ছবিটা দেখতে দেখতে উঠে দাঁড়ালেন। সোজা ; ঋজু, দৃঢ় তাঁর ভঙ্গি।

—তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ?

—করিনা ? হে পিতা ! তুমি স্বর্গে আছ। নাবিকটি নিজের বুকের উপর পবিত্র ক্রসের চিহ্ন আঁকল। তারপর আবার বলল—

—আপনাকে আর একমিনিট সময় দেব জমিদারমশাই।

—জমিদারমশায় ? আমায় জমিদারমশায় বলছ কেন ?

—দেখলেই বোঝা যায় আপনি জমিদার।

—তোমার জমিদার আছেন ?

—থাকবেন না ? মস্ত জমিদার তিনি। জমিদার না থাকলে চলে নাকি ?

—তিনি কোথায় ?

—জানি না। এ দেশ ছেড়ে গেছেন—এইটুকু জানি। তাঁর নাম কি জানেন ? তাঁর নাম মার্কুইস দ্য লাঁতেনা, ভাইকাউণ্ট দ্য ফন্টিনে, ব্রিট্যানীর প্রিন্স—সাত অরণ্যের মালিক তিনি।

—তাঁকে দেখেছ ?

—তা অবশ্য দেখিনি। কিন্তু তাতে কি ? তিনি যে আমার প্রভু তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

—যদি তাঁর দেখা পাও, আর যদি তিনি তোমাকে কোনো আদেশ দেন তবে কি করবে ?

—তাঁর আদেশ মানব।

—মানবে ? কেন ?

—মানব না ? কি আশ্চর্য ? তাঁর আদেশ না মানা তো মহাপাপ।

—কেন ? মহাপাপ কেন ?

—মহাপাপ নয় ? ঈশ্বরকে মানতে হবে। রাজাকে মানতে হবে।

মনিবকে মানতে হবে। অমান্য করা পাপ। কিন্তু যাক, সে সব কথার তো কোনো দরকার নেই। আপনি আমার ভাইকে হত্যা করেছেন—আমি আপনাকে হত্যা করব।

—করবেই ?

—হ্যাঁ।

—বেশ কর। কিন্তু পুরোহিত কোথায় ? ধর্মযাজক ?

নাবিকটি আবার হাঁ হয়ে গেল—'পুরোহিত ?'

—হ্যাঁ। পুরোহিত। তোমার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল যখন, তখন সেখানে একজন পুরোহিত ছিল। ছিল কি ?

—তা ছিল।

—সুতরাং এখানেও একজন পুরোহিত দরকার।

—ন্-ন্-নেই তো। সমুদ্রে কি পুরোহিত থাকে ?

—তা হলে আমার আত্মার সদ্গতি হবে কি ভাবে ?

ধর্মভীরু নাবিক। ঈশ্বরে, রাজায়, জমিদার, মনিবে অগাধ বিশ্বাস তার। ক্ষণেকের ক্রোধে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ স্পৃহায় সে উন্মত্ত। কিন্তু বৃদ্ধের এই কথায় সে চিন্তায় পড়ে গেল। তাইতো ? কি করা যায়! ক্রমশই বিহ্বল হয়ে পড়ছে সে।

বৃদ্ধ তার মুখভাব লক্ষ্য করলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে থাকলেন—

—দেখ। আমার আত্মার যদি বিনাশ হয়, আর তার কারণ যদি হও তুমি, তবে ভেবে দেখ তোমার আত্মারও বিনাশ ঘটবে। সেও নরকে যাবে। তোমার উপর আমার করুণা হচ্ছে। তোমার যা ইচ্ছে তাই কর। তোমার ভাইকে দণ্ড দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। আমি দিয়েছি। আমার কর্তব্য তোমার আত্মাকে রক্ষার চেষ্টা করা। তাও করব। এখন দায়িত্ব তোমার। ভেবে দেখ।

বৃদ্ধ দেখলেন নাবিকটি বিচলিত। এমন সময়ে কামানের আওয়াজ শোনা গেল।

—শুনতে পাচ্ছ কামানের শব্দ ?—একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ নাবিকটির মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর আবার বললেন—

—শুনছ কামানের শব্দ ? ওখানে মানুষ মারা যাচ্ছে। অগণিত মানুষ। কত সন্তান তাদের বাপ-মাকে আর জীবনে দেখতে পাবে না, বহু পিতা তাদের সন্তানদের আর কখনো দেখতে পাবে না, অসংখ্য ভাই আর তাদের ভাইকে দেখবে না, তোমারই মতো। কিন্তু সেটা কার দোষে ? তোমার ভাইয়ের দোষে। তুমি তো ঈশ্বরে বিশ্বাস কর। একবার ভাব তো ঈশ্বর এই মুহূর্তে কি কষ্টই না পাচ্ছেন। তুমি তো রাজাকে ভক্তি কর—ভাব তো শিশু রাজা এই মুহূর্তে কি কষ্টেই না কারাগারে বন্দী হয়ে আছেন। ভাবতো ব্রিট্যানীর ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলো এই সময়ে লাঞ্ছিত, গির্জা কলুষিত, ধর্মগ্রন্থ পদদলিত, যাজকেরা নিহত। আর যে জাহাজ থেকে আমরা চলে এলাম, সেই ক্লেমোর এখন শত্রুর গোলায় গোলায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু এই ক্লেমোর নিয়ে আমরা কোথায় চলেছিলাম একবার ভাব তো। চলেছিলাম ভগবানের সন্তানদের রক্ষা করতে, তাদের উদ্ধার করতে। আমরা সফল হলে ঈশ্বরের বিপন্ন সন্তানেরা রক্ষা পেত, রাজা মুক্তি পেতেন ; কিন্তু তা হল না। কেননা ক্লেমোর জাহাজ ক্ষতবিক্ষত, ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে, তাই দিগভ্রষ্ট। সেই ক্লেমোরের ক্ষতির জন্য দায়ী কে ? যদি না কাল রাতে কামানটা শেকল ছিঁড়ে ফেলত, তাহলে তো ক্লেমোর অক্ষত থাকত। আর কামানটা শেকল ছিঁড়ল কার দোষে ? তোমার ভাইয়ের দোষে। সে যদি না কাজে অবহেলা করত তবে এতক্ষণ আমরা অক্ষত ক্লেমোরে করে গিয়ে নামতে পারতাম ফ্রান্সের—আমাদের জন্মভূমির—আমাদের মাতৃভূমির উপকূলে। ক্লেমোরের সব ক'জন নাবিক সৈনিক জীবিত অবস্থায় দলবদ্ধ হয়ে শ্বেতবর্ণ রাজপতাকা উড়িয়ে ফ্রান্সের রাজাকে উদ্ধার করার জন্য, ঈশ্বরের সেবার জন্য, তাঁর নির্দেশিত কর্তব্য সাধনের জন্য নিজেদের

উৎসর্গ করতে পারত। আর বল সেইজন্যই তো আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে বেরিয়েছিলাম—তাই নয় কি? কিন্তু সকলে চলে গেল মরণের কোলে—সকলে। আমাকে রেখে দেওয়া হল ঐ অসমাপ্ত কাজটি করার জন্য—সে তো তুমি শুনেইছ। আর সেই কাজটাও যাতে না হয় তার জন্য তুমি আমাকে হত্যা করতে চাইছ। তা কর হত্যা।

—এই যে যুদ্ধ! এ যুদ্ধ কিসের জন্য? শয়তানকে দমন করার জন্য! ঈশ্বরকে সেবা করার জন্য। পাপের বিরুদ্ধে—ধর্মের পক্ষে। সেই যুদ্ধ করার জন্যই আমি রয়ে গেছি। তুমি আমাকে গুলি করে মারতে চাইছ—মার। মেরে ধার্মিকদের বিরুদ্ধে পাপীদের পক্ষে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শয়তানের পক্ষে কাজ কর। আমার ব্রিট্যানী পৌঁছোন দরকার, সেটা তুমি বন্ধ করতে চাইছ—কর। ফলটা কি হবে জান? গ্রাম জ্বলবে, কৃষকদের রক্তে মাটি ভিজে লাল হয়ে যাবে, যাজকদের প্রাণ সংশয় হবে, রাজার কারাবাস অনন্ত হবে, যীশুর দুঃখের শেষ থাকবে না—তিনি কাঁদবেন। আর তার জন্য দায়ী হবে কে? তুমি। শয়তানের জয় হবে—কৃতিত্ব তোমার। গির্জা ভেঙে পড়বে—দায়ী হবে তুমি। আমাকে মারতে চাও—মার। শয়তানকে সাহায্য করতে চাও—কর। পাপকে বাড়তে দিতে দাও—দাও। আর তার জন্য আমাকে তোমার খুন করতে হবে—কর। যদিও এর জন্য আমার আত্মা প্রস্তুত নয়—তার সদ্গতি হবে না—তার দায় তোমার। এবং আমাকে হত্যা করার জন্য তোমার আত্মারও গতি হবে না—দু'জনের আত্মারই হবে নরকবাস। আর তার জন্য তুমিই হবে দায়ী। আমি তো বৃদ্ধ—তুমি যুবক। আমি নিরস্ত্র—তুমি অস্ত্রধারী—। নাও আমায় হত্যা কর—কর হত্যা—গুলি চালাও।

সমুদ্রের ঢেউয়ে তরণী দোদুল। তারই উপর দাঁড়িয়ে শির উন্নত করে ঋজুদেহে বৃদ্ধ কথাগুলো বলে চললেন। গলার স্বর যেন সমুদ্র গর্জনের মতোই গভীর—গম্ভীর।

ধর্মভীরু কৃষকটির মনস্তত্ত্ব ভালোই বুঝেছিলেন বৃদ্ধ। তাঁর প্রতিটি

কথা যে সরল প্রাণ কৃষক নাবিকটিকে অন্তরে আঘাত করছে—সে তার মুখের চেহারাতেই প্রমাণ। তাই বৃদ্ধের গলার স্বর ক্রমশই উচ্চ থেকে উচ্চগ্রামে চড়ছে। আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে নাবিকটি ঘামছে দরদর করে। ঝড়ের তাণ্ডবে কেঁপে কেঁপে ওঠা গাছের মতোই তার শরীরটাও কাঁপছিল। ভয়ে আতঙ্কে সে জপমালাটাকে আঁকড়ে ধরল, বার বার সেটাকে মাথায় ঠেকায়, বুকে ঠেকায়। কখনো করে ভক্তিতে চুম্বন। বৃদ্ধের কথা শেষ হতে না হতেই হাতের পিস্তলটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ের উপর। কান্না মেশানো গলায় চিৎকার করে উঠল—

—ক্ষমা, ক্ষমা করুন প্রভু। দয়া করুন আমায়। আমি মহাপাপী। মহাপাপ করেছি। আমার ভাইও পাপী—সেও পাপ করেছে। তার অপরাধে যে সর্বনাশ ঘটেছে—আমি তার প্রতিকারের চেষ্টা করব, জীবন দিয়েও চেষ্টা করব। বলুন আমায় কি করতে হবে। প্রভু আপনি কেবল আমায় আদেশ করুন—আমি সে আদেশ অবশ্যই পালন করব। কেবল হুকুম করুন। তার আগে আমাকে ক্ষমা করুন—ক্ষমা।

—আমি তোমায় ক্ষমা করেছি।

## চার

ছত্রিশ ঘণ্টা পর।

ফ্রান্সের উপকূলে এসে নামলেন দু'জনে।

সামান্যই খাবার ছিল নৌকোয়। বৃদ্ধ একটি মাত্র বিস্কুট নিজের জন্য রেখে বাকী খাবারটা হ্যামালোকে দিয়ে দিলেন। হ্যামালো তাকিয়ে রয়েছে দেখে মুখ খুললেন তিনি—

—দু'জনের একসঙ্গে যাওয়া চলবে না। তুমি যাও ডাইনে—আমি বাঁয়ে। আর এই রুমালটা নাও। এটা আমার সেনাপতি পদের

অভিজ্ঞান। এর উপরে এই যে দেখছ রক্তপদ্ম আঁকা—এটা রানী নিজে বুনেছিলেন মৃত্যুর আগে—কারাগারে বসে। এই রুমাল যাকে দেখাবে—সেই বুঝবে তুমি আমারই দূত। সারা দেশ তোমাকে ঘুরতে হবে, সমস্ত রাজভক্ত ব্রিট্যানীবাসীদের তোমাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের ডেকে ডেকে বলবে—জাগো ভেণ্ডি, বিদ্রোহের শক্তি বৃদ্ধি কর—সাধারণতন্ত্রীদের নির্মূল কর—। দয়া নেই—মায়া নেই—ক্ষমা নেই—প্রশ্রয় নেই।

হ্যামালো প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিল। যতদূর—যতক্ষণ তাকে দেখা যায়—বৃদ্ধ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরপদে এগোলেন—চিন্তামগ্ন।

জায়গাটা হচ্ছে মাউণ্ট সেণ্ট মাইকেল উপসাগরের তীর। এখানে ছোট বড়—অজস্র বালিয়াড়ি। সব চেয়ে বড় বালিয়াড়ি যেটা তার মাথায় ধীরে ধীরে উঠলেন বৃদ্ধ। এখান থেকে সমস্ত অঞ্চলটা ভালো-ভাবে নজরে আসে। দিকনির্ণয় এবং গন্তব্যস্থান ঠিক করার জন্য জায়গাটা উপযুক্ত।

বৃদ্ধ একেবারে মাথায় উঠলেন। বালিয়াড়ির একদম উপরে বহুকালের পুরনো প্রায় ভেঙে পড়া একটা পাথরের স্তম্ভ। তাতেই হেলান দিয়ে বসলেন ভদ্রলোক। দৃষ্টিটা নীচের দিকে। এদিকটায় পথঘাট তাঁর চেনা। তবুও তারই মধ্যে বিশেষ একটি পথের চিহ্ন খুঁজবার জন্য শ্যেনচক্ষুতে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

এই বালিয়াড়ির উপর থেকে এগারটি শহর এবং গ্রাম দেখা যায়। সমুদ্র-উপকূল জুড়ে তাঁর ডাইনে ও বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে উঁচু উঁচু ঘণ্টা-স্তম্ভগুলো—দাঁড়িয়ে রয়েছে সজাগ প্রহরীর মতো।

হঠাৎই চমকে উঠলেন বৃদ্ধ।

দিগন্তে তাঁর দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি আটকে গেল একটি ঘণ্টাস্তম্ভে। এই ঘণ্টাস্তম্ভটির নাম আছে একটি, যেমন নাম আছে প্রত্যেকটি

ঘণ্টাস্তম্ভেরই। মানুষটির দৃষ্টি আটকে গেছে যে স্তম্ভটিতে তার নাম করমারের ঘণ্টাস্তম্ভ।

কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এভাবে আটকে গেল কেন? চমকেই বা উঠলেন কেন বৃদ্ধ পুরুষটি?

প্রত্যেকটি স্তম্ভের মাথায় একটা করে চুড়ো। চুড়োর নীচে চারদিক খোলা একটা খাঁচার মতো—আর সেই খাঁচাতেই ঝোলে ঘণ্টাগুলো। করমারের স্তম্ভের সেই খাঁচাটা একবার যেন খুলছে আরেকবার যেন বন্ধ হচ্ছে। একবার আলো—একবার অন্ধকার। পালা করে। এর মানে কি? এই আলো—এই আঁধার—? এই খোলা—এই বন্ধ! চমকে উঠেছেন তাই মানুষটি, চোখটা আটকে গেছে তাঁর। ব্যাপারটা কি?

ব্যাপারটা বুঝলেন। ঘণ্টা দুলছে দ্রুতবেগে। মানে ঘণ্টা বাজছে। কিন্তু শব্দ নেই কেন?

শব্দ নেই কেন—তাও বুঝলেন তিনি। এই উঁচুতে বাতাস বইছে তাঁর দিক থেকে ঘণ্টার দিকে—। অর্থাৎ শব্দের গতি তাঁর দিক থেকে ঠিক বিপরীতে।

চকিতে তিনি অন্য ঘণ্টাগুলোর দিকে চোখ ফেরালেন। একই ব্যাপার। একবার আলো—একবার অন্ধকার। দৃষ্টিকে আরো একাগ্র করলেন—না—কোনো ভুল নেই। সব ক'টি ঘণ্টা বেজে চলেছে। নিঃশব্দে। অদ্ভুত!

সব ক'টি ঘণ্টা—ঐ তো—রগার-পিঁকা, ট্যানী, কোটিল, প্রিসি, ক্রোলোঁ, ক্রয়ে এভাঞ্চি, কুয়েনন, মরড্রে, পা, পণ্টরসন সব বেজে চলেছে; যদিও একটারও শব্দ তাঁর কানে এসে পৌঁছোচ্ছে না।

না পৌঁছোক। বাজছে। কিন্তু বাজছে কেন? পাগলের মতো বেজে চলেছে কেন ঘণ্টাগুলো?

কোনো বিপদবার্তা কি শোনাতে চায় ঘণ্টাগুলো সমগ্র ফ্রান্স-বাসীদের!

চোর পালিয়ে গেলে, খুনে দস্যু ফেরার হলে, বিদেশী শত্রু দেশ আক্রমণ করলে, দেশে লুঠতরাজ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলে, দেশবাসীদের সজাগ করার জন্যই একমাত্র বাজে এই ঘণ্টা। তা এখন কোন শত্রুর আগমন বার্তা শোনানোর জন্য ঘণ্টাগুলো বেজে চলেছে ?

কে সে ? কে সেই শত্রু ?

সে শত্রু—সে শত্রু স্বয়ং তিনি নন তো ??

হঠাৎই এই ইস্পাত কঠিন মানুষটিরও মেরুদণ্ড বেয়ে যেন নেমে এল বরফ জল !

কিন্তু—কিন্তু তাঁর এখানে আসার খবর এরা জানবে কি করে ? এরই মধ্যে সাধারণতন্ত্রীরা কিভাবে জানবে তাঁর ফরাসী উপকূলে অবতরণের খবর ? তিনি তো বলতে গেলে এইমাত্র এখানে এসেছেন। তাছাড়া তিনি যে কে সে পরিচয়টা তো এক জানতেন বয়বার্থেলো আর ভিউভিল—দু'জনেরই লাভ হয়েছে বীরশয্যা। তাহলে ?

মাথার উপরে কি যেন একটা অনেকক্ষণ ধরে খসখস করছে। চোখ তুলে তাকালেন বৃদ্ধ। একটা কাগজ। ভাঙা পাথরের স্তম্ভে একটা বিরাট বিজ্ঞাপন সাঁটা। চারকোণের একটা কোণের আঠা খুলে গেছে, তারই ফলে উঠে যাওয়া কোণটা হাওয়ায় উড়ছে।

আসলে উল্টো দিক দিয়ে উঠেছেন বলে কাগজটা তাঁর নজরে আসেনি। উঠে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। কাগজের আলগা দিকটা হাত দিয়ে চেপে ধরে পড়বার চেষ্টা করলেন। আকাশ পরিষ্কার। জুনের গোধূলি দীর্ঘ। বালিয়াড়ির নীচে আঁধার এগিয়ে আসছে, কিন্তু উপরে এখনো যথেষ্ট আলো। বিজ্ঞাপনটির কিছু অংশ বড় হরফে। আলোর তেজ যতটা তাতে তিনি বড় অক্ষরগুলো পড়তে পারলেন—পড়লেন।

'ফরাসী সাধারণতন্ত্র—এক ও অখণ্ড'

সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে আমি, চেরবুর্গের উপকূলে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রতিনিধি, জানাচ্ছি যে—লঁাতেনার ভূতপূর্ব মার্কুইস,

ভাইকাউন্ট ত্য ফন্টিনে, তথাকথিত ব্রিট্যানীর প্রিন্স গোপনে গ্রানভিলের উপকূলে এসে নেমেছেন। তাঁকে দস্যু বলে ঘোষণা করা হল। জীবিত বা মৃত তাঁর মাথার দাম—ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক। টাকাটা দেওয়া হবে সোনায়, কাগজে নয়। খবর পাওয়া মাত্র তথাকথিত ল'াতেনার মাকু´ইসকে ধরার জন্য সেনাদল পাঠানো হবে। সমস্ত গ্রামকে সাহায্য করতে আদেশ করা হচ্ছে।

টাউন হল, গ্রাণভিল স্বাক্ষর / প্রিওর ত্য লামার্ণ

দোসরা জুন, সতেরশ' তিরানব্বই

স্বাক্ষরিত নামটার নীচে ছোট ছোট অক্ষরে আরো কিছু কথা লেখা ছিল। কিন্তু আলো কমে আসায় ভদ্রলোক আর সেগুলো পড়তে পারলেন না।

তিনি আর দাঁড়াতেও চাইলেন না। বালিয়াড়ির মাথায় এখনো যে আলো আছে তাতে বহুদূর থেকেও তাঁকে দেখা যাবে। দ্রুত নেমে এলেন তিনি।

উনি চলেছেন এখন তাঁর পূর্ব পরিচিত একটি গোলাবাড়ির দিকে। তারই সঠিক পথটি চিনবার জন্যই তাঁর বালিয়াড়িতে ওঠা। পথটা চেনা হয়ে গেছে—সুতরাং পরিচিত পথে চলার নিশ্চিত ভঙ্গিতে তিনি হাঁটতে থাকলেন। একটু এগোবার পরই একটা পথের তেমাথা। সেখানেও সাঁটা একই ধরনের বিজ্ঞাপন।

বৃদ্ধ এগোলেন।

পিছনে ডাক, 'কোথায় যান?'

তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। যে ডেকেছে সেও বৃদ্ধ, কিন্তু চেহারাই মালুম দেয় মানুষটি ভিখিরি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল,

—কোথায় যান?

—এ কোন জায়গা?—বৃদ্ধের ফিরতি প্রশ্ন।

—ট্যানির জমিদারি—ভিখিরির উত্তর,—মানে আপনারই জমিদারি।

—আমার?

—হ্যাঁ। কারণ আপনিই মার্কুইস দ্য লাঁতেনা।

* * *

পরিচয়টা সত্যি। এই রহস্যময় বৃদ্ধই মার্কুইস দ্য লাঁতেনা, ভাইকাউন্ট দ্য ফন্টিনে, ব্রিট্যানীর প্রিন্স।

মার্কুইস ভিক্ষুকের কথা শুনে বুঝলেন তাঁর পরিচয় গোপন নেই। তাই বললেন—

—চিনেছ দেখছি, ধরিয়ে দাও।

—এখানে আপনারও ঘর, আমারও। আপনার বাস দুর্গে—আমার ঝোপেঝাড়ে।—উত্তরটা ভিক্ষুকের।

—কথার প্রয়োজন কি? যা করতে চাও করে ফেল। ধরিয়ে দাও।

—কোথায় যাচ্ছিলেন? হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়িতে তো?

—হ্যাঁ।

—যাবেন না।

—কেন?

—নীলের দল এখন ওটা অধিকার করে নিয়েছে।

—কবে থেকে?

—তিন দিন হল।

—গোলাবাড়ি বা গাঁয়ের লোকজন বাধা দেয় নি?

—না। সবাই দোর খুলে অভ্যর্থনা করেছিল।

—বটে!!

অদূরে গাছের মাথার উপরে গোলাবাড়ির ছাদ এখনো দেখা যাচ্ছে। লোকটি সেদিকে আঙুল তুলে বলল—

—ছাদটা দেখতে পাচ্ছেন মার্কুইস?

—পাচ্ছি।

—কিছু একটা উড়ছে বুঝতে পারছেন ?

—হ্যাঁ।

—পতাকা।

—তাই বটে !

—ত্রিবর্ণ পতাকা। সাধারণতন্ত্রের পতাকা। —তারপর গলায় জোর এনে লোকটি বলল—'আপনাকে গুলি করে মারবে। তার চেয়ে আমার বাড়িতে গেলে রাতটা ঘুমোতে পারবেন। আপনি শ্রান্ত ক্লান্ত; আপনার বিশ্রামের দরকার! তাই বলছি আমার বাড়িতেই চলুন।'

লঁাতেনা নীরব রইলেন।

—ওদিকে কাল সকালে নীলের দল অন্যদিকে এগিয়ে যাবে—তখন আপনিও ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি যেতে পারবেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লঁাতেনা বৃদ্ধটিকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এইবার প্রশ্ন করলেন,

—তুমি কোন দলে ? সাধারণতন্ত্র না রাজা ?

—আমি ভিখিরি।

—রাজার পক্ষেও না সাধারণতন্ত্রের পক্ষেও না ?

—মনে তো তাই হয়।

—তুমি রাজার পক্ষে না বিপক্ষে ?

—ওসব ভাবব কখন ? সময়ই নেই।

—এই যে এতসব ঘটনা ঘটে চলেছে—এ সম্পর্কে তোমার মত কি ?

—কি খাব তারই জোগাড় থাকে না—

—তবু তুমি আমাকে সাহায্য করতে চাইছ। কারণ কি ?

—কারণ—দেখছি ওরা আপনাকে দস্যু বলে ঘোষণা করেছে। আচ্ছা ওরা এই ঘোষণা করল কিভাবে ?

—ওটাই ওদের আইন।

—আইন কি?

—আইন হচ্ছে যা দিয়ে দেশ শাসন করার নিয়ম তৈরী হয়।

—আপনার আইন আছে?

—আমার আইন—রাজার আইন।

—তা সেই আইনে কি আপনি দস্যু?

—না। সে আইনে ওরাই দস্যু।

—তার মানে আইন এক একজনের কাছে এক একরকম।

—তাতো বটেই।

—আর সেই আইনে এক একজন এক একজনকে দস্যু বলে ঘোষণা করে দিতে পারে, মানেটা কি হল?

—মানেটা হল এক এক আইনে এক একজন অপরাধী।

—তার মানে এদের আইনে আপনি সাহায্য পাচ্ছেন না, বরঞ্চ আইনের নিয়মে যে সাহায্য মানুষের পাওয়া উচিত আপনি তার বাইরে?

—হ্যাঁ।

—আইন তো মানুষকে আশ্রয় দেবে তাই নয় কি?—তা না দিয়ে ইচ্ছে মতো একজনকে আইনের আশ্রয় থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলা দেওয়া যায়? সেটাও ঐ আইনের তৈরী দেশ শাসনের যে নিয়ম না কি বললেন তারই জোরে! মজা তো মন্দ নয়। তাহলে আইনটা কি? তার ভিতরেই বা কিভাবে থাকা যায়—বাইরেই বা কি ভাবে লোকে চলে যায়? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা আমি কি আইনের তৈরী ঐ নিয়মের বাইরে না ভিতরে?

—কি বলতে চাইছ?

—কিছু যে বুঝতে পারছি না। আমি যে অনাহারে মরি সেটা কি আইনের নিয়মের ভিতরে না বাইরে?

—অনাহারে মরছ কতদিন? —কঠিন প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন লাঁতেনা।

—সারাটা জীবন।

—তবু তুমি আমায় রক্ষা করবে?

—করব।

—কেন?

—কেন? কারণ আমার মনে হল আপনি আমার থেকেও অভাগা। আমার অন্তত নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার আছে—আপনার তাও নেই।

—সে কথা সত্যি। তাহলে তুমি আমাকে বাঁচাবে?

—কাজেই প্রভু—আজ আমরা ভাই-ভাই। আমরা দু'জনেই ভিক্ষুক। আমার ভিক্ষে একটা রুটির জন্য—আপনার ভিক্ষে জীবনের জন্য।

—কিন্তু তুমি কি জান যে, আমার মাথার উপরে দাম ধরেছে ওরা?

—জানব না কেন?

—জান, তার দাম ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক?

—জানি।

—টাকাটা কাগুজে নোটে দেওয়া হবে না যে অকেজো হয়ে যেতে পারে, দেওয়া হবে একেবারে স্বর্ণমুদ্রা।

—তাও জানি।

—ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক। সোনার টাকা। পেলে যে কেউ বড়লোক হয়ে যাবে।

—তাতো যাবেই।

—তবু তুমি আমায় বাঁচাতে চাইছ?

—সেইজন্যই তো চাইছি।

—কেন? সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।

—কেননা, আমার মনে হল আপনাকে বাঁচাবার জন্য আমার এগিয়ে আসা দরকার। নইলে যে কেউ আপনাকে ধরিয়ে দিয়ে

একলহমায় বড়লোক হয়ে যাবে। আপনাকে তাই লুকিয়ে ফেলতে হবে। চলুন আর দেরি করবেন না।

—চল। বিস্মিত-চমকিত ল'াতেনা বৃদ্ধ ভিখিরিকে অনুসরণ করলেন। চলতে চলতে এবার জিজ্ঞাসা করলেন—

—তোমার নাম কি ?

—টেলেমার্ক।

—কোথায় ভিক্ষে কর ?

—এই অঞ্চলেই। আপনি যখন দেশে থাকতেন তখন কতদিন আমায় ভিক্ষে দিয়েছেন! কিন্তু ভিক্ষে দিয়েছেন ভিক্ষুককে—তারো যে মানুষের মতো একটা মুখ আছে সেটা তো দেখেননি কোনো দিন, দেখলে আজ আমাকে আপনি নিজেই চিনতে পারতেন।

## পাঁচ

পরের দিনের সকাল।

খুব ভোর ভোর মার্কুইসকে জাগিয়ে দিল টেলেমার্ক।

—এই হচ্ছে আপনার বেরিয়ে পড়ার সময়। হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়ি এখন শান্ত। নীলের দল হয় অন্যত্র সরে গেছে নয় এখনো ঘুমিয়ে আছে।

মার্কুইস যুক্তিটা মেনে নিলেন। তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লেন টেলেমার্কের সঙ্গে।

আগের দিন যে তেমাথায় তাঁর দেখা হয়েছিল টেলেমার্কের সাথে দু'জনে একসঙ্গে সেই পর্যন্ত এলেন। তারপর টেলেমার্কই কথা বলল—

—আমি যাই ভিক্ষের খোঁজে। আপনি যান আপনার কাজে। তবে সাবধানে যাবেন।

টেলেমার্ক ঝোপঝাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেল।

এবার কোন পথ ?

মার্কু´ইস ভালো করে চারদিকটা নজর করে দেখে নিচ্ছিলেন ; পা বাড়াবার আগে সঠিক পথটা ঠিক করে নিতে হবে। হঠাৎই নজরে এল ভাঙা পাথরের গায়ে লটকানো গতকালকে দেখা বিজ্ঞপ্তির আরেকটা নকল। আগের দিন আলোর অভাবে সবটুকু পড়া যায় নি। লামার্ণের সই-এর তলায় ছোট ছোট অক্ষরে আরো কিছু সব লেখা ছিল ; সেটুকুও পড়া দরকার। এগিয়ে গেলেন মার্কু´ইস।

চোখের সামনে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরগুলো যেন আগুনের ফুলকি হয়ে নাচতে থাকল মার্কুইসের সামনে।

"মার্কুইস দ্য লাঁতেনাকে চিনতে পারলেই গুলি করে মারা হবে।"

স্বাক্ষর / জোভেঁ

সন্ধানকারী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ।

জোভেঁ !

মার্কুইস তাকিয়ে আছেন ঘোষণাটার দিকে, কিন্তু মনটা কি কাগজটার উপর আছে ? কোথায় যেন হারিয়ে যেতে চায় মনটা ! আত্মমগ্ন মার্কুইসের মুখ দিয়ে স্বতোচ্চারিত হয়ে বেরিয়ে আসছে একটাই শব্দ—'জোভেঁ ! জোভেঁ !!'

আত্মমগ্ন মার্কুইস কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আবার পথ হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু কয়েক পা চলার পরই কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন তাঁকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল। আবারো বিজ্ঞাপনটা পড়লেন মার্কুইস, আবারো আগের মতোই কেমন হতচেতন হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ ; তারপর আবার সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পথ হাঁটা শুরু করলেন। চলছেন বটে পথ তিনি, কিন্তু সে চলার মধ্যে চেতনার লক্ষণ নেই, স্বপ্নের মধ্যে হাঁটার মতো তাঁর পদক্ষেপ। কেউ যদি তখন তাঁর পাশে থাকত তার কানে বারবার আসত অস্ফুট একটাই শব্দ— জোঁভে ! জোঁভে !

কিন্তু অন্যমনস্কতা তাঁর বেশীক্ষণ থাকল না। একটু দূর যেতেই

চমকে উঠলেন মার্ক্‌ইস। আরণ্য অঞ্চলের সকালের শান্তি ভেঙেচুরে হঠাৎই বেজে উঠল যেন অসংখ্য ভেরি। তারপরই মানুষের তর্জন, আর্তনাদ, বন্দুকের আওয়াজ—সব কিছু মিলিয়ে একটা বিকট, ভয়ঙ্কর, রক্তজল করা শব্দ আছড়ে পড়ল সকালের সোনা রোদ মাখা স্নিগ্ধ বনভূমির উপর। গোলাবাড়ির দিক থেকে একটা ঘন কালো ধোঁয়া নীল আকাশের দিকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে থাকল তীরবেগে। ধোঁয়া কালো—তার গায়ে আগুনের ডোরা দাগ। গোলাবাড়ি জ্বলে উঠল শুকনো এক আঁটি খড়ের মতো।

এত আকস্মিক ব্যাপারটা যে মার্ক্‌ইসও চমকে উঠলেন। এরকম একটা শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র ভোর—তাকে যেন নরকের চৌষট্টি আগুনে কেউ ডুবিয়ে দিচ্ছে। হার্ব-এন-পেইলের দিকে যুদ্ধ হচ্ছে। কিন্তু কে করে যুদ্ধ? কার সঙ্গে কার যুদ্ধ?

মানুষ মাত্রই কৌতূহলের দাস। এ ধরনের ঘটনায় মানুষের কৌতূহল আরো প্রবল হয়ে ওঠে। তখন সেই কৌতূহল না মেটানো পর্যন্ত মানুষ স্বাভাবিক হতে পারে না—কৌতূহল মেটাতে গিয়ে নিজের বিপদ হতে পারে এ সম্ভাবনার কথাটাও তখন মানুষ ভুলে যায়। মার্ক্‌ইসও মানুষ। তার উপর ঘটনাটা যুদ্ধ। নিজের বিপদের কথাও ভুলে গেলেন মার্ক্‌ইস—ঘটনাটা কি—এটাই জানার ইচ্ছে তাঁর প্রবল হয়ে উঠল।

যে পথে চলছিলেন—তার পাশেই ছিল একটা ছোট ঢিবির মতো! তার উপর উঠলে চারপাশটা আরো ভালো করে নজরে আসবে—মার্ক্‌ইস চড়তে থাকলেন ঢিবিটার উপর।

এই ঢিবির মতো মাটির চুড়োটার চারপাশে ঝোপঝাড়, দুর্গম কাঁটার জঙ্গল। জঙ্গলটা চারপাশ দিয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরই আরেক প্রান্তে হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়ি। খাল, নালা, পরিখা, গুপ্তপথ—সব মিলিয়ে জঙ্গলটা যেন গোলকধাঁধা। মার্ক্‌ইস উঠে পড়লেন চুড়োটার উপর।

কিন্তু ততক্ষণে গোলমাল আবার থেমে গেছে। হঠাৎই শুরু—হঠাৎই শেষ। হত্যালীলা যদি হয়েই থাকে তবে তা শেষও হয়ে গেছে। সময় বেশী নেয়নি।

মার্কুইস চুড়ো থেকে দেখলেন জঙ্গলটা বিধ্বস্ত। তারপরই তাঁর চোখে পড়ল গাছের আড়ালে আড়ালে বহু মানুষের দ্রুত আনাগোনা। সৈন্য !

গোলাবাড়ি থেকে এখানে এসে ঢুকেছে। সকলেরই চলাফেরায় কিছু খোঁজার চেষ্টা। বন্দুক নামানো, কিন্তু কোনো কিছুর অনুসরণ করছে তারা, কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে ; কিন্তু কাজের মধ্যে কোন শৃঙ্খলতা নেই—কেমন যেন ছন্নছাড়া হালচাল। যতটা না কাজ হচ্ছে, তার বেশী চেঁচামেচি, কোলাহল। কাছে, দূরে, পাশে, সামনে যে যেমন পারছে চিৎকার করে চলেছে। কিন্তু তারই মধ্যে মার্কুইস শুনতে পেলেন একটা সমুদ্র গর্জনের মতো সমবেত ধ্বনি—তীক্ষ্ণ—তীব্র ; কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম। শব্দটা—'লাঁতেনা ! লাতেনা !!'

আচ্ছা ! লোকগুলো তাহলে তাঁকেই খুঁজছে।

বাস্তব—অতি কঠিন বাস্তবে ফিরে এলেন মার্কুইস। বিপদ—ভয়ঙ্কর বিপদ। কিন্তু ভেবে কিছু করবার আগেই—

আগেই চারদিকে বনের মধ্যে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল অজস্র বন্দুক, সঙ্গীন, তরবারি। ওঁর মনে হল তাঁর কানের ঠিক নীচেই যেন কয়েকটা কামানের গোলা ফাটল—আর সে গোলায় একটাই শব্দ 'লাঁতেনা। লাঁতেনা।'

মুহূর্তে লাঁতেনার চোখের সামনে ভেসে উঠল অজস্র, সহস্র মুখ—আর মুখ—হিংস্রতায় ভরা।

ঝোপে জঙ্গলে গাছের আড়ালে সহস্র সহস্র হিংস্র সৈনিক, হাতে তাদের বন্দুক, তরবারি ; তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ চুড়োর উপর দাঁড়ানো মার্কুইসের উপর। এদিকে চুড়োর উপর তিনি একা—একেবারে

একা। তিনি দু'একজনের মুখ দেখতে পেলেও অধিকাংশই আড়ালে —কিন্তু তিনি সকলেরই চোখের সামনে। প্রত্যেকে তাঁকে স্পষ্ট

ভাবে দেখতে পাচ্ছে—আর তাদের বন্দুকের নল সোজা তাঁর বুক লক্ষ্য করেই উদ্যত।

মার্কুইস—একা—নিরস্ত্র—অসহায়।

না আর বিলম্ব করার কোন অর্থই হয় না।

পকেট থেকে বার করলেন তিনি একটা ফুল।

সাদা—সিল্কের।

নিজের টুপিতে আটকে দিলেন তিনি।

এই ফুল রাজপক্ষীয়দের নিদর্শন।

নিজেকে প্রকাশিত করে দিলেন মার্কুইস। তারপর গলা চড়িয়ে বললেন—

—তোমরা যাকে চাইছ, আমিই সে। আমিই মার্কুইস দ্য লাঁতেনা, ভাইকাউন্ট দ্য ফর্টিনে, ব্রিট্যানীর প্রিন্স—রাজকীয় চতুরঙ্গ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। নাও—কর হত্যা।

—কিন্তু?

কিন্তু ভয়ঙ্কর নলে গুলির আওয়াজ কোথায়? কোথায় কোষমুক্ত তরবারির ঝনৎকার। কোথায় হিংস্র উল্লাস?

তার বদলে কি দেখলেন মার্কুইস? তার বদলে কি শুনলেন? দেখলেন সৈনিকের দল নতজানু।

শুনলেন বিলম্বিত লয়ে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে জয়ধ্বনি হাজারো কণ্ঠে—

—জয় লাঁতেনা! জয় মার্কুইস দ্য লাঁতেনা!! জয় সর্বাধিনায়ক লাঁতেনা!!!

জয়ধ্বনি দিচ্ছে সৈনিকেরা, আনন্দে মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে, আতিশয্যে তরবারি ঘোরাচ্ছে মাথার উপর, টুপি ছুঁড়ে মারছে এখানে ওখানে, কেউ কেউ আবার লাঠির ডগায় বাদামী টুপি লাগিয়ে সেগুলো আন্দোলিত করছে।

লাঁতেনার চারপাশে এখন ভেণ্ডির সৈন্য। এরাই সেই সাধারণ-তন্ত্র বিরোধী, রাজতন্ত্রপক্ষীয় ভেণ্ডির বিদ্রোহী সেনাদল। নতজানু, উল্লসিত, উৎফুল্ল।

এদের মধ্য থেকেই এগিয়ে এলেন এক সম্ভ্রান্ত যুবক। মার্কুইসের সামনে এসে নিজের তরবারিটি তাঁর সামনে রেখে নতজানু হয়ে বললেন—

—আপনাকেই আমরা খুঁজছি। আপনাকে পেয়েছি এ আমাদের ভেণ্ডির সৌভাগ্য। আজ থেকে আমাদের নেতা আপনি। এতদিন নেতৃত্ব দিয়েছি আমি, আজ থেকে আমি আপনার আজ্ঞাবহ সেনাপতি। আদেশ করুন।

তরবারিটা তুলে নিলেন লাঁতেনা। তারপর মাথার উপর ঘুরিয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন—'জয় রাজার জয়।'

সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠল। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠল—জয় রাজার জয়। জয় মার্কুইসের জয়। জয় লাঁতেনার জয়।

মার্কুইস যুবকটির দিকে জিজ্ঞাসার চোখে তাকালেন—

—তোমরা কতজন?

—সাতহাজার।

—তোমার নাম কি?

—গ্যাভার্ড।

—কাল রাতে বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে ছিল?

—হ্যাঁ। আপনার জন্য। আর তাইতেই তো আগুন জ্বলে উঠল। ঐ ঘণ্টা আর আপনার মাথার উপর মূল্য ধার্য করে বিজ্ঞাপন—ব্যস্। সমস্ত অঞ্চলটা ক্ষেপে উঠল একেবারে। সবাই জানল আপনি দেশে ফিরে এসেছেন, আর লাঁতেনাকে পেলে ভেণ্ডি ডরায় কাকে বলুন? দেখতে দেখতে সাতহাজার কৃষক অস্ত্র নিয়ে তৈরী। কালকে এরাই হয়ে যাবে পনের হাজার।

—তোমরাই তাহলে হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়ি আক্রমণ

—ভালো।

—আমার একটি ঘোড়া আছে, সেটা আপনি ব্যবহার করবেন ?

—করব।

সামরিক সাজপরা একটা সাদা ঘোড়া নিয়ে এল একজন কৃষক। একলাফে তাতে সওয়ার হলেন লাঁতেনা ! সৈনিকরা আর একবার জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

গ্যাভার্ড এগিয়ে এসে সামরিক অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন—

—আমাদের শিবির কোথায় হবে সেনাপতি ?

—ফুজিয়ার্সের মহারণ্যে। সৈনিকদের সেখানে যেতে বল।

গ্যাভার্ড সৈনিকদের জানিয়ে দিলেন সেনাপতির আদেশ। তারপর আবার লাঁতেনার কাছে ফিরে আসতেই লাঁতেনা জিজ্ঞাসা করলেন—

—হার্ব-এন-পেইলের লোকেরা কি নীলের দলকে অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করেছিল ?

—হ্যাঁ। সেনাপতি।

—বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—গ্রামটা ?

—না।

—পোড়াও।

—নীলের দল আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরা ছিল সংখ্যায় মাত্র দেড়শ'—আমরা সাতহাজার।

—কোত্থেকে এসেছিল ?

—প্যারী। পতাকায় লেখা ছিল লালটুপির পল্টন।

—জানোয়ারের দল।

—আহতদের নিয়ে কি করব ?

—শেষ করে দাও।

—বন্দীদের ?

—গুলি কর।

—আশিজন আছে।

—বলছি তো গুলি কর।

—হু'টি স্ত্রীলোক আছে।

—একই আদেশ। গুলি।

—তিনটে শিশু আছে।

—ওদের সঙ্গে নাও। পরে ভাবব কি করা যায় ওদের নিয়ে।

মার্কুইসের ঘোড়া ছুটে বেরিয়ে গেল।

* * *

ভোরের অন্ধকারে তেমাথায় এসে হু'টি মানুষ হু'ধারে চলে গিয়েছিলেন। একজন ভিক্ষুক, একজন জমিদার। অভিজাত। অন্যভাবে একজন দাতা, জীবনদাতা ; একজন গ্রহীতা।

জায়গাটার নাম ট্যানী।

আগের সন্ধ্যেবেলায় যখন টেলেমার্ক আর মার্কুইসে সাক্ষাৎ হয়েছিল তখন মার্কুইসের প্রশ্নের জবাবে টেলেমার্ক বলেছিল—এটা ট্যানীর জমিদারি—যার মালিক স্বয়ং মার্কুইস দ্য লাঁতেনা। আর সেইজন্যই ভিক্ষাজীবী টেলেমার্কের অতীতের দেখা ভিক্ষাদাতা লাঁতেনাকে চিনতে দেরি হয়নি।

ট্যানীর তেমাথা থেকে সেই ভোরের আলো ফুটবার আগেই টেলেমার্ক, বৃদ্ধ ভিক্ষুক টেলেমার্ক বেরিয়েছিল হু'টো রুটির সন্ধানে। দিন কেটে গেছে। সূর্য এখন পশ্চিমে, গোধূলির আলো চরাচরকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করছে ; এখনই নামবে সন্ধ্যা।

টেলেমার্ক ট্যানী থেকে চলে গিয়েছিল ক্রলোঁর পথে। মানুষটা বুড়ো, হাঁটে। হাঁটাই তার কাজ, দোরে দোরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরতে হলে হাঁটতেই হবে। পেট বড় বালাই। কিন্তু অশক্ত মানুষ, তাই হাঁটায় বেগ নেই, পায়ের জোর কোথায়! বেশীদূর যাওয়ার

ক্ষমতা তার নেই—কেননা রাতের আগেই তাকে ফিরতে হয় আস্তানায়। তাই ক্রয়ে-এভাঞ্চি পর্যন্ত গিয়ে আবার সে ফেরার পথ ধরল—সেই ক্রলোঁর পথ।

ট্যানীতে যখন মার্কুইসকে ঘিরে একটা জমজমাট নাটক হচ্ছে তখন টেলেমার্ক ট্যানী থেকে দূরে।

নাটক শেষ হয়ে গেছে। রঙ্গমঞ্চের নায়করা চলে গেছে ফুজিয়ার্সের অরণ্যে। নির্দেশকের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে তারা।

ট্যানীর এই নাটকের দর্শকদের মধ্যে টেলেমার্ক ছিল না—সে তখন দরজায় দরজায় রুটির পাত্র নিয়ে ঘুরছে।

এখানে কি ঘটেছে তাই তার জানা নেই।

জানার সময় কোথায় তার?

রাজা আসে যায়, জমিদার থাকে বা না থাকে, ভিক্ষুককে তো ভিক্ষে করতেই হবে। সে তন্ত্র বোঝে না, সাদা বোঝে না, বোঝে না নীল। সাধারণতন্ত্রই বা কি আর রাজতন্ত্রই বা কি—কিছুই তার মাথায় নেই। আইন তার বুদ্ধির অগম্য। একটা বোধ খালি আছে, ক্ষমতা থাকলে বিপন্নকে বাঁচাও।

তো সেই অতিসাধারণ, শক্তিতে অক্ষম, দু'টো রুটির জন্য দোরে দোরে ঘোরা টেলেমার্ক আপন আস্তানার দিকে ফিরছে। পা আর চলে না, শরীর বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইছে।

ফিরতি পথে একটা জায়গা। ছোট। নাম ম্যাসী। সেখানে আছে একটা টিলা। তারই কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎই টেলেমার্কের নজরে এল আসন্ন সাঁঝের আকাশে শুধু ধোঁয়া—কালো—কালো ধোঁয়া। হলুদ বাঘের গায়ে যেমন কালো ডোরা দাগ থাকে, টেলেমার্ক দেখল এই কালো ধোঁয়ার ভিতর তেমনি লাল ডোরা। ধোঁয়াটা উঠছে হার্ব-এন-পেইলের দিক থেকেই।

টেলেমার্ক ভাবনায় পড়ল। এ ধোঁয়া কিসের?

টেলেমার্ক ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন। তবু ঐ ধোঁয়াটা! ধোঁয়া যেখানে আগুন সেখানে। প্রবাদ আছে। প্রবাদটা তো সত্যি। আর তার প্রমাণ ঐ কালো ধোঁয়ার মধ্যেকার লাল আগুনের ডোরা দাগ।

না। কারণটা না জেনে চলে যাওয়া যায় না। অন্তত টেলেমার্ক তো তা পারে না।

পা টেনে টেনে চলল বুড়ো।

ম্যাসীর টিলায় উঠে দেখল টেলেমার্ক।

উঠল বটে, নামতে আর পারে না।

একটা গল্প আছে—কে যেন এক অগ্নিকাণ্ড দেখে পাথরে পরিণত হয়েছিল। গল্প যদি সত্যিও না হয়; টেলেমার্ক তো সত্যি! আর তার চোখের সামনে যে ছবিটা ফুটে উঠল তাতে সে পাথরের মতোই নিস্পন্দ। শরীরে রক্ত চলাচলও যেন বন্ধ। নিঃশ্বাস নিতে সে ভুলে গেছে।

একে কি আগুন বলে? তাহলে রুটি পাকাবার জন্য চুলোয় যে আগুন জ্বলে ওঠে তাকে কি বলবে?

এ যেন অগ্নিবন্যা—এ যেন জীবন্ত আগুন পাহাড়—এ যেন ফুঁসে ওঠা অগ্নিসমুদ্রের তরঙ্গ। নিঃশব্দ কোথাও কোন শব্দ নেই—কেবল কাঠ আর ঘরের চাল পোড়ার শব্দ। কোন মানুষ চিৎকার করার বোধহয় সুযোগও পায়নি। সমস্ত গোলাবাড়িটা মায় গোটা গ্রামটা অগ্নিকবলিত।

আগুন তার কাজ করে চলেছে। কোনো মানুষ বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময় পর্যন্ত পায়নি। কোথাও কোনো প্রতিবন্ধকতা পর্যন্ত নেই। একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ করার সময়টুকুও পায়নি কেউ। আগুন তার আপন ইচ্ছায় গ্রাস করে চলেছে সমস্ত গ্রামটাকে। বড় বড় গাছগুলো পর্যন্ত জ্বলছে। আগুনের আরেক নাম সর্বভূক্। সবকিছু খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। কিন্তু এ কি ধরনের নিস্তব্ধতা! বীভৎস। ভয়ানক। রক্ত হিম করে দেয়।

ধীরে ধীরে নেমে এল টেলেমার্ক। কানটাকে যতটা পারা যায় উৎকর্ণ করল। যদি—যদি একটা ক্ষীণ শব্দ কোথা থেকে শোনা যায়। কোনো কাতরোক্তি, কোনো আর্তনাদ, কোনো কথার টুকরো, কিছু একটা যদি নড়তেও দেখা যায়! নাঃ কোনো শব্দ নেই—এক কাঠপোড়ার পট্‌পট্‌ আওয়াজ ছাড়া। কোনো কিছু নড়ে না—এক আগুনের শিখা ছাড়া।

তবে কি সবাই পালিয়েছে? **সমস্ত গ্রামবাসী?** না হলে গেল কোথায় তারা?

টেলেমার্ক সন্তর্পণে হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়ির দিকে এগোল। একটু দ্বিধা—একটু সাবধানতা। কিন্তু?

এতক্ষণ যা দেখেছে তাকে যদি বলা যায় ভয়াবহ, এখন যা দেখছে তা কি বীভৎস—? এতক্ষণ যা দেখেছে তা যদি বীভৎস হয়ে থাকে তাহলে এখন যা দেখছে তা কি?

না—কোন উপমাই টেলেমার্কের সরল বুদ্ধিতে নেই।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। আকাশের অনেক উপর থেকে সে কি এই দৃশ্য দেখছে? বোধহয় না। তাহলে এমন আনন্দে নিজের আলোকে সে পাঠিয়ে দিতে পারত না এই গোলাবাড়ির ভিতর।

একদিকে আগুনের লেলিহান শিখার আলো—অন্যদিকে চাঁদের কিরণ—আর তারই মাঝে—

তারই মাঝে আগে ছিল না, এখন তৈরী হয়েছে একটা ছোটখাটো পাহাড়, স্তূপের মতো, আর তৈরী হয়েছে একটা দীঘি—দীঘি না হলেও পুকুর।

স্তূপটা মৃত মানুষের, পুকুরটা রক্তের।

হ্যাঁ মানুষগুলি সব মৃত। কঠিন কঠোর বাস্তব এক সত্য—মরা মানুষের স্তূপ।

কিন্তু তার থেকেও বাস্তব পুকুর। জীবন্ত। পুকুর জ্বলছে। মৃতমানুষের রক্তে তৈরী হয়েছে পুকুর আর সেই পুকুরের রক্ত আগুনে জ্বলছে।

ওঃ। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। মুহূর্তে পাগল করে দেওয়ায় মতো চেহারা জায়গাটার।

না। তবু টেলেমার্ক পাগল হল না। লাল পুকুরে লাল আগুনের আভা দেখে, মৃত মানুষের ঐ পাহাড় দেখেও টেলেমার্ক অবিচলিত। কান্নাটা জমাট হয়ে রইল মনের ভিতরেই।

টেলেমার্ক একপা একপা করে এগিয়ে এল। ভয় নেই। আরো একটু এগোল। স্তূপ বরাবর। পরীক্ষা করল মানুষগুলোকে। না— একজনও বেঁচে নেই। নিপুণ ভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

চাঁদের আলো অমলিন, আগুনের আভা প্রজ্বলন্ত।

মৃতদেহগুলি দেখল সেই দুই আলোয় টেলেমার্ক। সবাই সৈনিক। পা তাদের খালি—জুতো নিয়ে গেছে। অস্ত্রহীন—সেগুলোও অন্তর্হিত। সামরিক পোশাকগুলো রয়ে গেছে। কেননা এরা সাধারণতন্ত্রী। এদের পোশাক অন্যদের কাজে লাগবে না।

এই সৈনিকরাই আগের দিন হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়িতে বিশ্রাম করছিল। এদের গুলি করে মারা হয়েছে। সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে করা হয়েছে গুলি। প্রত্যেকটি দেহেই গুলির চিহ্ন।

একটা দীর্ঘশ্বাস বুঝিবা ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছিল টেলেমার্কের। নীরবেই সে বেরিয়ে আসছিল। নিঃশব্দে। একটা নীচু দেওয়ালের কাছ দিয়ে চলে আসার সময়ে দেখল চারটে পা বেরিয়ে আছে। পাশাপাশি পড়ে আছে দু'জন। পায়ে জুতো আছে। জুতো আছে—কেননা পাগুলো স্ত্রীলোকের। দেহ দু'টোই গুলিবিদ্ধ। টেলেমার্ক পরীক্ষা করে দেখল। একজন—মৃত। গুলিটা শরীরটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় জন? একি? এর হৃদ্‌পিণ্ডটা যে এখনো ধুকধুক করছে। গুলি এরও লেগেছে, কিন্তু কাঁধে। হাড় ভেঙে গেছে। প্রাণটা এখনও আছে।

প্রাণটা আছে। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কি করে? টেলেমার্ক চেঁচিয়ে উঠল,—'কেউ আছ এখানে? কেউ?'

প্রথমে একটা মাথা, তারপরে আরেকটা। কোন একটা ফুটো দিয়ে ধীরে—ভয়ে—সন্তর্পণে বেরিয়ে এল দু'জন সন্ত্রস্ত কৃষক। যে ভাবেই হোক, খুনের তাণ্ডবের সময়ে পালাতে পেরেছিল এরা।

তিনজনে মিলে ধরাধরি করে আহত—অজ্ঞান রমণীকে নিয়ে এল টেলেমার্কের আস্তানায়। শুইয়ে দিল সেই বিছানায়, যেখানে শুয়ে গতরাতে প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল মার্কুইস দ্য লাঁতেনার। সেই বিছানাতেই পরের রাতে প্রাণরক্ষার সেবায় আত্মনিয়োগ করল ভিখিরি টেলেমার্ক আরেকজনের—আরেক অসহায় স্ত্রীলোকের।

—কে এই কাণ্ড করল?—টেলেমার্ক জিজ্ঞাসা করল একজন কৃষককে।

—কে আবার? আমাদের জমিদার মাকুইস দ্য লাঁতেনা। তিনিই তো আদেশ দিলেন—গুলি কর। পুড়িয়ে মার। জ্বালিয়ে দাও গোলাবাড়ি আর গ্রাম।

আকাশের দিকে তাকিয়ে টেলেমার্ক অস্ফুটস্বরে কেঁদে উঠল—আগে যদি জানতাম?

ছয়

জুনের আঠাশে। সতেরশ' তিরানব্বই। চারবছর হয়ে গেছে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

আমরা চোখ ফেরাই এবার খোদ প্যারী শহরের দিকে।

ফরাসী বিপ্লব। পৃথিবীর ইতিহাসে সতেরশ' উননব্বই খৃষ্টাব্দ এক অসাধারণ বছর। রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক রাজার বদলে সাধারণ প্রজার সরকার। পৃথিবীর ইতিহাসে উজ্জ্বলতম ঘটনা। প্রথমও বটে।

এই বিদ্রোহেরই তিন নেতা। সাধারণতন্ত্রের ধারক।

রোবসপিয়র—দাঁতোঁ—ম্যারা।

হিন্দু পুরাণে যেমন তিন ঈশ্বর—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সাধারণতন্ত্রেও এঁরা তেমনি তিন মহাশক্তিধর নায়ক।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে আকৃতি ও প্রকৃতিতে যেমন পার্থক্য—এঁদের তিনজনেরও তেমনি।

ফারাক আছে অবশ্যই।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে আর যাইহোক পারস্পরিক কলহ নেই। এঁদের আছে।

পরস্পরের প্রতি এঁদের দ্বেষ—চরম। একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারেন না। মনের বা মতের মিল নেই কারোর সঙ্গে কারোর—চেহারায় তো নেইই। ভিতরে ভিতরে একে অন্যের ধ্বংস কামনা করতেন—যদিও প্রত্যেকে আবার প্রত্যেককে পেতেন ভয়। কেননা প্রত্যেকেরই ক্ষমতা অসাধারণ।

চেহারা—স্বভাব—আচরণ, তিনজনেরই আলাদা। তবু তিনজনকে একত্রিত হতেই হত—কাজের খাতিরে; দেশ পরিচালনার জন্য—নীতি নির্ধারণের জন্য। কিন্তু দেখা হলেই মতান্তর—মতান্তর থেকে ঝগড়া আর এই ঝগড়া বা মতান্তর সাধারণের গোচর হোক এটা আবার কেউই চাইতেন না। তাই যখনই তাঁদের কোনো কাজে একত্রিত হওয়ার দরকার হত তাঁরা এমন জায়গা বেছে নিতেন যেটা সাধারণের অগম্য, লোকচক্ষুর আড়াল।

আজকের এই আঠাশে জুনও তাঁরা এমনি একটা জায়গায় বসেছেন। জায়গাটা প্যারীশহরের একটা সরাইখানা। র‍্য-ছ্য-পাঁয়ো। সেই সরাইখানারই পিছন দিকে অন্ধকার একটি ঘরে বসেছেন তিনজন।

একজন একেবারে বাবু—রোবসপিয়র।

অন্যজন আকৃতিতে দৈত্য—দাঁতোঁ।

অপরজন চেহারায় বামন—ম্যারা।

সামনের টেবিলে কিছু কাগজপত্র—আরেকটি মানচিত্র।

আজকেও বাদানুবাদ শুরু হয়ে গেছে, উপলক্ষ এই কাগজগুলো। সশব্দে নিজের চেয়ারটা ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন দৈত্য দাঁতোঁ। গলাটা উচ্চগ্রামে।

—শোন। সাধারণতন্ত্রের সঙ্কট আসন্ন। আমি বুঝি একটাই কথা—উদ্দেশ্যও আমার একটাই। ফ্রান্সের শত্রু বিনাশ। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনে আমার সামনে যে উপায়ই থাকুক সেটা আমি গ্রহণ করি। রণে সবনীতিই আমার কাছে সাধু। যে কোনো উপায়ে শত্রুনিধন আমার কাছে সবথেকে বড় কাজ। সে কাজে যে পথই আমাকে নিতে হোক না কেন আমি নেব। আমার মতই হচ্ছে বিপদ যখন আসে তার প্রতিকার করতে হবে—আর প্রতিকারের শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে প্রতিহিংসা—বুঝলে। নির্মম হতে হবে—নির্মম। হাতি যখন পথ দিয়ে চলে যায় তার দেখার দরকার হয় না সে কি মাড়িয়ে চলেছে। তেমনি করেই আমাদের সব কিছু মাড়িয়ে চলে যেতে হবে।

—কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে শত্রু কোথায় ?—শান্ত গলায় বাবু রোবসপিয়রের জিজ্ঞাসা।

—শত্রু বাইরে। আমি তাকে ফ্রান্সের সীমানার বাইরে তাড়িয়েছি।—সগর্ব উত্তর দাঁতোঁর।

—না। শত্রু এখানে—দেশের ভিতরে। আমি তাকে নজরে রেখেছি।—ঝটিতি উত্তর রোবসপিয়রের।

—না। আমি শত্রুকে বিতাড়ন করেছি। তার পিছু ছাড়িনি এখনো।

—আভ্যন্তরীণ শত্রুকে তাড়ানো যায় না।

—তবে কি করা যায় ?

—নির্মূল।

—ঠিক। কোনো মতান্তর নেই। কিন্তু রোবসপিয়র—শত্রু ভিতরে নয়—বাইরে। আর আমার সেইটাই বক্তব্য।

—আমার কথা শোন দাঁতোঁ—শত্রু বাইরে নয়, ভিতরে।

—না। শত্রু সীমান্তে।

—শত্রু ভেণ্ডিতে।

—অকারণ তর্ক করছ তোমরা! শত্রু সর্বত্র। তোমাদের রক্ষে নেই।—কথাগুলো বললেন বামন ম্যারা।

রোবসপিয়র শান্ত কণ্ঠেই বললেন—

—বাজে কথায় লাভ নেই। প্রিওর দ্য ল্যামার্ণ যে খবর পাঠিয়েছেন, তা তোমাদের শুনিয়েছি। দাঁতোঁ, বুঝবার চেষ্টা কর। বৈদেশিক যুদ্ধে ভয় নেই—ভয় গৃহযুদ্ধে। ভেণ্ডি বিদ্রোহ করেছিল আগেই, কিন্তু তারা ছিল নানা দল-উপদলে বিভক্ত। এখন তারা এক নেতার পতাকাতলে সমবেত হয়েছে।

—সেই লোক?—দাঁতোঁর প্রশ্ন।

—হ্যাঁ সেই লোক। গত দোসরা জুন সে পণ্টরসনে নেমেছে। জান সে কে? তার উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই ও অঞ্চলের সাধারণতন্ত্রের সব প্রতিনিধি বন্দী হয়েছে?

—এবং কায়েন দুর্গে কারারুদ্ধ হয়েছে।—পাদপূরণ দাঁতোঁর।

রোবসপিয়র বলে চললেন—

—শোন। আমি সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি। অরণ্যের যুদ্ধ খুবই বড় আকার ধারণ করেছে। ইংরেজরা ওদিকে আক্রমণের জন্য তৈরী। ব্রিট্যানীদের পক্ষ নিয়েছে ব্রিটেন। ভেণ্ডির কৃষক বিদ্রোহ আর কিছুটা জোর পেলেই ইংরেজরা এসে যোগ দেবে তাদের সঙ্গে। দেখতে দেখতে ব্রিট্যানী প্রদেশ দখলে চলে যাবে ফ্রান্সের রাজার।

—অর্থাৎ—ইংরেজ রাজার।

—না, ফরাসী দেশের রাজারই। মনে রেখ ইংরেজ রাজা হলে ততো ভয় নেই। কেননা যে কোনো বিদেশী রাজাকে উৎখাত করা যায় আঠের দিনে, আর স্বদেশী রাজাকে সরাতে আমাদের লেগেছে আঠেরশ' বছর।

অকাট্য যুক্তি। দাঁতোঁ চিন্তামগ্ন। টেবিলের উপর কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁতোঁ গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন।

রোবসপিয়র বুঝলেন দাঁতো ভাবছেন। সুতরাং কথা বলে চললেন—

—তাহলেই বুঝতে পারছ—বিপদ কোথায়? ব্রিট্যানী একবার অধিকৃত হলে প্যারীর পথ ভেণ্ডির কাছে কত সোজা!

প্রচণ্ড রাগে যেন জ্বলে উঠলেন দাঁতোঁ। গায়ের সমস্ত শক্তিতে টেবিলের উপর ঘুষি মেরে বলে উঠলেন—

—রোবসপিয়র। ভুলে যেও না, ভাঁর্দ্যঁ যখন অধিকৃত হয় তখনো প্রুশিয়ানদের কাছে প্যারীর পথ সোজাই ছিল। কিন্তু সে পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

—হয়েছিল—তাতে কি হল?

—প্রুশিয়ানদের নাকে যেভাবে ঝামা ঘষে দিয়েছিলাম, সেইরকম ঝামা ঘষে দেব ভেণ্ডিদের মুখে।

দাঁতোঁ উত্তেজনায় থরথর করে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর উত্তেজিত উষ্ণ মুষ্টিবদ্ধ হাতের উপর নিজের নরম স্নিগ্ধ হাতটা রেখে রোবসপিয়র আবার বললেন—

—দাঁতোঁ। তুমি ভুলে যাচ্ছ—প্রুশিয়ানদের আর ভেণ্ডিদের অবস্থা এক নয়। প্রুশিয়ানরা যখন এসেছিল শ্যাম্পেন প্রদেশবাসীরা তখন তাদের সমর্থন করেনি। এক্ষেত্রে বিষয়টা একেবারে উল্টো। ব্রিট্যানীবাসীরা কিন্তু ইংরেজদের পক্ষে যাবে, কেননা তারাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ইংরেজদের। ভাঁর্দ্যঁ উদ্ধার করার জন্য যে যুদ্ধ সেটা বৈদেশিক যুদ্ধ, ব্রিট্যানী পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ হবে গৃহযুদ্ধ। তফাৎটা ভাব, তফাৎ অনেক।

চিৎকার করে উঠলেন দাঁতোঁ—

—এ তোমার পাগলামি। আসল বিপদ পুবে, তুমি বলবে পশ্চিমে। হ্যাঁ ইংলণ্ড ভয় দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ওদিকে পিরেনীজের

ওপার থেকে স্পেন ভয় দেখাচ্ছে না? আল্পসের ওপারে ইতালী ওত পেতে বসে নেই? রাইনের তীর ঘেঁষে জার্মানী রণসাজে সাজছে না। ভালুক রুশিয়া চুপ করে বসে আছে? চারপাশে বিপদ—মধ্যে আমরা। বিপদের একটা বৃত্ত—ফরাসীদেশ তার কেন্দ্রবিন্দু। আর ভিতরে—চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

এইবার কথা বললেন ম্যারা। খর্বকায় ম্যারা। স্বর গম্ভীর।

—এ বিপদে রক্ষা পেতে হলে চাই একজন একনায়ক—ডিক্টেটর। রোবসপিয়র, তুমি জান আমি চাই একজন ডিক্টেটর।

—জানি। হয় আমি, নয় তুমি—এই তো?—মাথা তুললেন রোবসপিয়র।

—হ্যাঁ। হয় আমি, নয় তুমি।

—তাই নাকি? চেষ্টা করেই দেখ।—দাঁত কিড়মিড় করে জবাব দাঁতোঁর।

ম্যারা আবার বললেন—

—দেখ একটা মীমাংসা করাই ভালো। দাঁতোঁ যা বলছে তাও সত্যি, রোবসপিয়র যা বলছে তাও সত্যি। কিন্তু সম্পূর্ণ সত্যি তোমরা কেউই বলছ না। দেশের যা সঙ্কট তাতে ডিক্টেটর নিয়োগ না করলে দেশটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন একতা। একঘণ্টা দেরি করলে কাল ভেণ্ডি দখল করে নেবে অর্লিয়েঁ, হু'দিনেই প্রুশিয়ানরা এসে পৌঁছোবে প্যারীতে। এক্ষেত্রে কর্তব্য কি? ডিক্টেটর নিয়োগ। এস—আমরা তিনজনেই ডিক্টেটর হই—আমরা তিনজনই বিদ্রোহের নায়ক।

কি আশ্চর্য! ম্যারার এই দীর্ঘ ভাষণ!—তারপরও হু'জনেই চুপ। কোনোরকম উৎসাহই তাঁদের নেই।

ম্যারা ক্ষেপে গেলেন।

—তাহলে তোমরা আমার কথা শুনবে না—এই তো। রোবসপিয়র—দাঁতো, তোমরা কিন্তু নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ

ডেকে আনলে। যে পথে তোমরা চলেছ, তাতে বেশীদূর যাওয়া যায় না। তোমাদের সামনে সব দরজাই বন্ধ—খোলা আছে একমাত্র কবরের পথ।

—সে তো ভালোই। ঘাড় নাড়লেন দাঁতো।

ম্যারা বললেন—

—ঘাড় নাড়ছ দাঁতোঁ? নাড়। কিছু মনে রেখ ঘাড় নাড়লে অনেক সময়ে ঘাড়ের উপর থেকে মাথাটা খসে যেতে পারে। তোমার ঐ জলদগম্ভীর আওয়াজ, ঐ আলগা গলাবন্ধ, ঐ হাঁটু পর্যন্ত ওঠানো বুট, জামার বিরাট বিরাট পকেট আর ঘন ঘন নেমন্তন্ন খাওয়ানোর বহর—এগুলো কিন্তু গিলোটিনে পড়ার লক্ষণ।

ম্যারা থামলেন না—ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করলেন রোবস-পিয়রকে।

—আর রোবসপিয়র, তুমি তো আবার নরমপন্থী। চুলে মাখ পাউডার, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাল্টে ফেল পোশাক—একেবারে লক্কা পায়রা আমার। এতো বাবুগিরির ফল কি জান? ফল গিলোটিন।

—হিংসুক।—বললেন দাঁতোঁ।

—হিংস্র।—বলে উঠলেন রোবসপিয়র।

ম্যারার চোখ দু'টো জ্বলে উঠল। গলায় শোনা গেল চাপা শাসানি—

—দাঁতোঁ! রোবসপিয়ের।

রোবসপিয়রের মুখ কালো হয়ে উঠল, দাঁতোঁর হল লাল। যখন তর্জন করে উঠেছিলেন তখন ম্যারার চোখ ছিল লাল। এইবার চোখের হিংস্র লাল আভা ধীরে ধীরে নিভে এল। তার জায়গায় দেখা দিল একটা নিষ্ঠুরতা, ঔদ্ধত্য, কিন্তু অদ্ভুত শান্ত ভাব দিয়ে সেটা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। ম্যারার এই দ্বৈত চেহারাটাই সহকর্মীদের কাছে সবচেয়ে ভয়ের।

দাঁতোঁ মনে মনে হার স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু মুখে তাঁরও একটা গর্জন—

—একতা আর ডিক্টেটরী নিয়ে যতই চেঁচান না কেন, ম্যারা জানেন কেবল কি করে সব ধ্বংস করতে হবে, কি করে সব তছনছ করতে হয়।

গলার মধ্যে ভয়াবহ শীতলতা। ম্যারা জবাব দিলেন—

—তোমাদের জন্য আমার একটা পরামর্শ আছে। মানলে উপকার হবে। তোমরা সব বাড়ি যাও। রাজনীতি তোমাদের জন্য নয়, সুখে শান্তিতে সংসার করার চেষ্টা কর—তোমাদের তাতেই মঙ্গল।

পিছন দিকে একটা দরজা। এক পা পিছু হটে ম্যারা সেই দরজার কাছে চলে গেলেন। বেরিয়ে যাচ্ছেন। সেখান থেকে এমন ভঙ্গিতে—'বিদায়-বন্ধুরা' বললেন যে সহকর্মীরা সেটা ম্যারার বিদায় সম্ভাষণ না ভীতি প্রদর্শন তা বুঝতে পারলেন না। তবে ভয়ে শিউরে উঠলেন এমনই ছিল ম্যারার গলার স্বর।

থমথমে পরিবেশকে ভেঙে সেই সময়ে ঘরের অন্যদিক থেকে একটা চতুর্থ স্বর শোনা গেল—

—না, ভুল কিন্তু আপনারই ম্যারা।

তিনজনেই চমকে ফিরে তাকালেন। নিজেদের মধ্যে ক্রুদ্ধ ঝগড়ায় কেউ খেয়ালই করেন নি কখন ওপাশ দিয়ে কি ভাবে এক ব্যক্তি তিনজনের এই গোপন সভায় অনধিকার প্রবেশ করেছেন।

তিনজনেরই রেগে ওঠার কথা। তিনজনেরই একসঙ্গে প্রতিবাদ করার কথা। কিন্তু তার পরিবর্তে এই মুহূর্তে সবথেকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলেন যে ম্যারা তিনিই বলে উঠলেন—

—আরে! নাগরিক সিমোর্দে! আসুন—আসুন।

আগন্তুক কিন্তু সাদর সম্বর্ধনার কোন প্রতি অভিবাদন জানাবার প্রয়োজনও বোধ করলেন বলে মনে হল না। আবারো বললেন—

—আপনিই কিন্তু ভুল করছেন ম্যারা!

রোবসপিয়র ও দাঁতোঁ জানেন ম্যারা ভয় পেলে তাঁর মুখের রঙ্টা কেমন সবুজ সবুজ হয়ে যায়। আগন্তুকের কথায় ম্যারার মুখ সেইরকম সবুজ হয়ে গেল।

—আপনাকে দিয়েও কাজ হয় বটে ম্যারা। কিন্তু দাঁতোঁ—রোবসপিয়রও অপরিহার্য - এটা ভুলে যাবেন না। ঐক্য। নাগরিকগণ। জনসাধারণ আপনাদের কাছে চায় ঐক্য—একতা।

সিমোর্দে টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন। দাঁতোঁ—রোবসপিয়র চেনেন তাঁকে। লোকটি যেন স্বয়ম্ভূ। পিছনের ইতিহাস এমন কিছু না। কিন্তু এই সময়ে যথেষ্ট ক্ষমতাশালী। কেননা জনসাধারণ সিমোর্দেকে দেখলেই নমস্কার করে।

দাঁতোঁ বুঝলেন ম্যারা সিমোর্দেকে ভয় পান। নাহলে সিমোর্দের ঐ রকম তিরস্কারের পরও তিনি চুপ করে থাকতেন না। অতএব সিমোর্দেকে খাতির করা যায়। দাঁতোঁ তাই বেশ আগ্রহ সহকারেই বললেন—

—আসুন নাগরিক সিমোর্দে। আপনি বরঞ্চ আমাদের মধ্যে থাকলে আমাদের সুবিধেই হবে। আমাদের মধ্যে মতের মিল হচ্ছে না, দেখা যাক আপনার মতটা কি ?—অভ্যর্থনার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁতোঁ বললেন—

—রোবসপিয়র, তুমি বরঞ্চ নাগরিক সিমোর্দেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।

দাঁতোঁ অবস্থা বুঝে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেন সিমোর্দেকে। সিমোর্দেও সুযোগটা নিলেন। বেশ ভারিক্কী চালে বললেন—

—বেশ তো। শুনি ব্যাপারটা কি ?

—ভেণ্ডি।- সংক্ষেপে উত্তর রোবসপিয়রের।

সিমোর্দে আরো গম্ভীর।

—হুঁ। ভেণ্ডি! ঠিক—আমাদের বিপদ এখন ঐখানেই সবচেয়ে বেশী। ফরাসী বিদ্রোহ যদি ব্যর্থ হয়—তবে হবে ভেণ্ডির জন্যই। দশটা জার্মানীর চেয়ে একটা ভেণ্ডি অনেক অনেক বিপজ্জনক। ভেণ্ডির দমন না হলে ফ্রান্সের সর্বনাশ।

এতবড় সমর্থন রোবসপিয়রের! তিনি মুগ্ধ। জিজ্ঞাসা করলেন—

—আপনি আগে ধর্মযাজক ছিলেন না ?

—হ্যাঁ নাগরিক।

— তাতে কি আসে যায় ! - দাঁতোঁর গলা।

—ঠিক। যাজকেরা যদি লোক ভালো হয়, তবে তারা সাধারণ নাগরিকের থেকে ভালো হয়। বিদ্রোহের সময়ে একটা গির্জার ঘণ্টা কামানের মতো কাজ করে, যদি যাজকেরা বিদ্রোহের সময়ে নাগরিকে পরিণত হয়।—জবাবটা সিমোর্দের।

—ঠিক। ঠিক।—বললেন রোবসপিয়র—কিন্তু যা বলছিলাম—ভেণ্ডি।

—কি হয়েছে ? কি করেছে ভেণ্ডি ?

—আর কিছু নয়, একজন নেতা সংগ্রহ করেছে। বললেন রোবসপিয়র।

—নেতা ! কে সে ?

—ভূতপূর্ব মার্কুইস দ্য লাঁতেনা—নিজেকে বলে ব্রিট্যানীর প্রিন্স।

মাথা নাড়লেন সিমোর্দে।

—চিনি। একসময়ে ওঁদের বাড়িতেই আমি পুরোহিত ছিলাম আর—

—আর ?

—আর ওঁর ভাইপোর ছেলের ছিলাম গৃহশিক্ষক।

রোবসপিয়র বললেন—

—লোকটা কিন্তু সাংঘাতিক। নৃশংস। হিংস্র। নিষ্ঠুর। গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। আহতদের ধরে ধরে খুন করে। বন্দীদের সার দিয়ে গুলি করে মারে। স্ত্রীলোকদেরও রেহাই নেই।

—স্ত্রীলোকদেরও ?

—হ্যাঁ। তিন শিশুর মা—এক রমণীকে গুলি করে মেরেছে, বাচ্চাগুলোর কি হল কেউ জানে না। তবে হ্যাঁ—

—তবে হ্যাঁ কি ?

—লোকটা প্রকৃত সেনাপতি। যুদ্ধ বোঝে।

—সেটা জানি। ও হ্যানোভারের যুদ্ধে ছিল।

—এখন ভেণ্ডিতে।

—কতদিন ?

—তিন সপ্তাহ।

—ওকে দস্যু বলে ঘোষণা করতে হবে।

—করা হয়েছে।

—ওর মাথার উপর মূল্য ধার্য করতে হবে।

—তাও করা হয়েছে।

—যে তাকে ধরে দেবে সে পাবে বিরাট পুরস্কার। এমন একটা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া দরকার।

—দেওয়া হয়েছে।

—পুরস্কার কাগুজে টাকায় নয়, স্বর্ণমুদ্রায় দিতে হবে।

—তাই বলা হয়েছে।

—এবং তাকে গিলোটিন করা চাই।

—সেটা তো পরে, ধরা পড়লে।

—কিন্তু ধরা পড়ার পর সেটা করার দায়িত্ব কার ?

—আপনার।—রোবসপিয়রের এই শেষ কথায় চমকে উঠলেন সিমোর্দে।

—আমার ?

—হ্যাঁ। আপনার। আপনাকে অসীম ক্ষমতা দিয়ে আমরা জন নিরাপত্তা সমিতির প্রতিনিধি করে পাঠাব।

—ঠিক আছে। আমি রাজী।

একজন প্রশাসকের যতগুলি গুণ থাকা দরকার, তার মধ্যে একটা বড় গুণ হল লোক চেনা। রোবসপিয়রের এই গুণটা ছিল। তিনি সিমোর্দের সম্মতি পাওয়া মাত্র ব্যাগ থেকে কাগজ বার করলেন।

তার মাথায় ছাপা রয়েছে—'ফরাসী সাধারণতন্ত্র এক ও অখণ্ড। জন নিরাপত্তা সমিতি।'

সিমোর্দে বললেন।

—হ্যাঁ। আমি রাজী আছি। ভীষণের বিরুদ্ধে ভীষণ। লাঁতেনা হিংস্র—আমিও হিংস্র হব। ও সাংঘাতিক আমিও সাংঘাতিক হব। ও নিষ্ঠুর আমাকেও নিষ্ঠুর হতে হবে। এই লোকটার বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চাই। ভগবানের দয়া হলে—এর হাত থেকে আমি সাধারণতন্ত্রকে রক্ষা করব।

—ভগবান?—দাঁতোঁ বললেন—'ভগবানের যুগ শেষ হয়ে গেছে'।

—আমি ভগবানে বিশ্বাস করি—সিমোর্দের জবাব। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,

—আমাকে কার কাছে পাঠানো হবে ?

—লাঁতেনার বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল যুদ্ধ করছে তার অধ্যক্ষের কাছে। তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি সেও কিন্তু একজন অভিজাত বংশীয়।

—তাতে কি আসে যায়? যাজক সম্বন্ধে যে কথা অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত সম্পর্কেও সেই কথা। লোক ভালো হলে এরা চমৎকার।—গর্জন করে উঠলেন দাঁতোঁ।

—সত্যি। কিন্তু জনসাধারণ ওদের অবিশ্বাস করে। যাজক এবং অভিজাতদের। যখন একজন যাজককে একজন অভিজাতের উপর খবরদারি করার জন্য নিয়োগ করা হয় তখন দায়িত্বটা বেড়ে যায় দ্বিগুণ। সে অবস্থায় যাজকের পক্ষে অনমনীয় মনোভাব নেওয়াটা কিন্তু অত্যাবশ্যক।

—অবশ্যই।—রোবসপিয়র বললেন।

—শুধু অনমনীয় হলেই চলবে না, নির্মম হতে হবে।

—আপনার বক্তব্য সম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই নাগরিক সিমোর্দে। আপনি যার কাছে যাচ্ছেন, বয়সে সে তরুণ। সামরিক প্রতিভা

তারও যথেষ্ট। পনেরদিন ধরে লাঁতেনার অগ্রগতি সে রোধ করে দিয়েছে।

—বাঃ।

—কিন্তু ওর একটা দোষ আছে।—মন্তব্যটা করলেন ম্যারা।

—কি দোষ?—সিমোর্দে জানতে চাইলেন।

—দয়া। যুদ্ধে সে কঠোর। কিন্তু যুদ্ধের পর সে কোমল হয়ে যায়। লোককে প্রশ্রয় দেয়, ক্ষমা করে, দয়া করে। বন্দীকে মুক্তি দেয়। সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশীয় স্ত্রী-কন্যাদের রক্ষা করে, মঠের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের রেহাই দেয়।

—এতো অন্যায়।—সিমোর্দের জবাব।

—অন্যায়? বলুন অপরাধ।—ম্যারা উত্তেজিত।

দাঁতোঁ বললেন,—'কখনো কখনো তাই বটে।'

রোবসপিয়র বললেন—'কখনো কখনো না অধিকাংশ সময়েই।'

ম্যারা বললেন—'অধিকাংশ নয়—সব সময়েই।'

—দেশের শত্রুর সঙ্গে ব্যবহারে, সবসময়েই—উত্তরটা সিমোর্দের।

ম্যারা এইবার সিমোর্দের দিকে তাকিয়ে বললেন—

—আচ্ছা, যদি সাধারণতন্ত্রের কোনো সেনাপতি রাজপক্ষের কোনো সেনাপতিকে মুক্তি দেয়?

—আমার হাতে পড়লে সেই সাধারণতন্ত্রীকে আমি হত্যা করব।

—হত্যা করবেন?

—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।

—বাঃ।—উত্তরটা ম্যারার।—'তাহলে রোবসপিয়রের মতেই মত দিলাম আমি। জন নিরাপত্তা সমিতির প্রতিনিধি করে তাহলে নাগরিক সিমোর্দেকে পাঠানো হোক উপকূল রক্ষী বাহিনীর অধ্যক্ষের কাছে। হ্যাঁ—ওর নামটা যেন কি?'

রোবসপিয়র বললেন—'এও একজন অভিজাত বংশের লোক।' বলে কাগজ ওল্টাতে লাগলেন।

দাঁতোঁ বললেন—'ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। এই অভিজাত সম্ভ্রান্তদের আগলাতে পারে যাজকরাই। একজন যাজক একা থাকলে সে অবিশ্বাসের পাত্র, একজন অভিজাত সম্ভ্রান্তবংশের লোক একা থাকলে সেও অবিশ্বাসের কারণ হতে পারে—কিন্তু যখন দুই সম্প্রদায়ের দু'জন একত্রে থাকে আমি আর তাদের কাউকে ভয় করি না। কারণটা কি জানেন—এরা নিজেদেরই পরস্পরকে এতো অবিশ্বাস করে যে একে অপরের উপর নজর রাখবে। তখন কাজ চলে ভালো।'

সিমোর্দের মুখে সবসময়েই একটা অহঙ্কারী আত্মসচেতন ভাব থাকে। একথাটায় সেটা আহত হল, তার ফলে মুখটা হয়ে উঠল কঠিন। কিন্তু মনে মনে ভেবে দেখলেন সিমোর্দে, কথাগুলো শুনতে অশিষ্ট, কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ মন্তব্য। তাই প্রকাশ্যে কোনো রাগ দেখালেন না, আবার দাঁতোঁর দিকে মুখও ফেরালেন না, যেন তাঁর কথাটাকে তিনি অগ্রাহ্য করছেন, অবজ্ঞা করে উড়িয়েই দিচ্ছেন। কিন্তু কঠোর স্বরে কেবল বললেন—

—সাধারণতন্ত্রীয় যে সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব আমার উপর রইল, তার কোনো একটি অন্যায় হলেই, আমি তাকে শাস্তি দেব। সে শাস্তি হবে মৃত্যু।

রোবসপিয়র তখনো কাগজ ঘেঁটেই চলেছেন। এতক্ষণে চোখ তুলে বললেন—

—এই যে নাগরিক সিমোর্দে, সেনাধ্যক্ষের নামটা পেয়েছি। যার উপর কর্তৃত্ব দিয়ে আপনাকে পাঠানো হচ্ছে সে একজন তথাকথিত ভাইকাউন্ট।

—তা নামটা কি?

—নামটা—জোভেঁ।

কে যেন এক বোতল কালি ঢেলে দিল সিমোর্দের মুখে। বিবর্ণ মুখে প্রায় আর্তনাদ করে তিনি বললেন—

—জোভেঁ!

ম্যারা তাঁর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।

সিমোর্দে আবারো করুণ কণ্ঠেই প্রায় বললেন—'ভাইকাউন্ট জোভেঁ ?'

রোবসপিয়র বললেন,—'হ্যাঁ।'

যাজকের দিকে দৃষ্টিটাকে স্থির রেখে ম্যারা বললেন,—'হলটা কি?'

রোবসপিয়র বললেন,—'নাগরিক সিমোর্দে—। আপনি তাহলে আপনার নিজেরই প্রতিশ্রুত শর্তে সৈন্যাধ্যক্ষ জোভেঁর কাছে জননিরাপত্তা সমিতির প্রতিনিধি হয়ে যেতে প্রস্তুত তো ? কথাটা কি পাকা ?'

বিবর্ণ থেকে বিবর্ণতর হচ্ছিল সিমোর্দের মুখ। সে মুখ থেকে কোনোরকমে উত্তরটা বেরিয়ে এল—

—প্—পাকা।

কাগজ সই হল। সিমোর্দে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। প্রায় টলতে টলতেই বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

জোভেঁ ! জোভেঁ ! কঠিন হৃদয় সিমোর্দের বুকটা যেন কেমন কেঁপে উঠতে থাকল। নৃশংস হতে চেয়েছেন সিমোর্দে। তবে কেন এক অজানা মহাপরিণামের আশঙ্কায় তিনি ভীত হয়ে উঠছেন ?

জোভেঁ ! ভাইকাউন্ট জোভেঁ !

মার্কুইস দ্য লাঁতেনার ভাইপোর ছেলে—ভাইকাউন্ট জোভেঁ।

সিমোর্দের যাজক জীবনের সঙ্গহীন একাকীত্বের একমাত্র আকর্ষণ—জোভেঁ। তাঁর প্রিয়তম ছাত্র। পুত্রাধিক প্রিয়। জোভেঁর অতি শিশু বয়স থেকে তিনি তার শিক্ষক ! সেই শিক্ষকতা শেষ হল যখন, তখন জোভেঁ যুবক। আর তখনই শুরু হচ্ছে ফরাসী বিদ্রোহ। সেই প্রবল ঝঞ্ঝায় দু'জনে দু'দিকে ছিটকে পড়েছেন। এতদিন পর আবার যোগাযোগ হবে। মাথার উপর একটি ছাতা—জন নিরাপত্তা সমিতি। কিন্তু ভবিষ্যৎ কি ?

লৌহহৃদয় সিমোর্দে। কিন্তু সেই লোহার হৃদপিণ্ডটাকেই কি

এক অমঙ্গল আশঙ্কা যেন পিষে ফেলছে, তাঁর নিঃশ্বাসটা কেন আটকে আসতে চাইছে ?

## সাত

জুলাই মাসের একটা দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

পণ্টরসন শহরের ঢুকবার মুখেই একটা সরাইখানা।

গোধূলির আলোটা বড় সুন্দর।

এই সময়ে এক অশ্বারোহী এসে ঘোড়া থামালেন সরাইখানার দরজায়। আসছেন তিনি এভ্রাঞ্চির দিক থেকে।

ঘোড়সওয়ারের পরনে ঢিলেঢালা আলখাল্লার মতো জামা একটা। মাথায় টুপি। টুপিতে ত্রিবর্ণ ফুল। আলাখাল্লার নীচে কোমরবন্ধ—সেটাও ত্রিবর্ণ। কোমরবন্ধ থেকে ঝুলছে দু'টি পিস্তল ও একটি তরবারি।

ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজে সরাইখানার মালিক দরজা খুলে বাইরে এল। প্রথমেই তার নজর পড়ল আগন্তুকের মাথার ফুলটির দিকে। বুঝল সে, আগন্তুক সাধারণতন্ত্র সমর্থক।

তাই সম্বোধন করল যখন—তখন নাগরিক বিশেষণটি যোগ করেই সে কথা বলল।

—নাগরিক, আপনি কি এখন এখানেই থাকবেন ?

—না।

—কোথায় যাবেন তাহলে ?

—ডল।

—তাহলে আমার অনুরোধ—হয় এখানেই থেকে যান নয়তো যেখান থেকে এসেছেন—সেই এভ্রাঞ্চিতেই ফিরে যান।

—কেন ?

—কারণ, ডলে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে।

—তাই নাকি ?—অশ্বারোহীর প্রশ্ন।

সরাইওয়ালা একটা চাড়িতে করে ঘোড়াকে খাবার দিয়ে তার মুখের লাগামটা খুলে দিল। ঘোড়া খাবার পেয়েছে, খাচ্ছে।

সরাইওয়ালা কথা বলে চলেছে।

—নাগরিক, আপনি কি ঘোড়াটি সামরিক প্রয়োজনে সংগ্রহ করেছেন ?

—না।

—আপনার নিজের ঘোড়া ?

—হ্যাঁ। কিনেছি। কেন ?

—এখন কোথা থেকে এলেন নাগরিক ?

—প্যারী।

—সোজা প্যারী থেকে ?

—না।

—তাওতো বটে। কি করেই বা সোজা আসবেন ? সব পথই বন্ধ তো। দু'দিন বাদে ডাকও চলবে না। চলবেই বা কি করে ? ঘোড়াই তো পাওয়া যাচ্ছে না। যাও বা পাওয়া যাচ্ছে—তার দাম দ্বিগুণ—তিনগুণ। আর ঘোড়ার খাবারের দাম যে কত বেড়েছে, তার কোনো হিসেবই নেই। ঘোড়াটা কোথা থেকে কিনলেন নাগরিক ? আসেঁকোতে ?

—হ্যাঁ।

—সারাদিনই ঘোড়ার পিঠে ?

—ভোর থেকে।

—একটা পরামর্শ দিই, শুনুন নাগরিক। আজ রাতটা বিশ্রাম করুন। আপনিও শ্রান্ত, আপনার ঘোড়াও।

—ঘোড়ার শ্রান্তিবোধের অধিকার আছে হে, মানুষের নেই।

সরাইওয়ালা কি বুঝল সেই জানে। কথা না বাড়িয়ে ঘোড়াকে জল এনে দিল।

তখন আগন্তুকই প্রশ্ন করলেন—

—ডলে যুদ্ধ হচ্ছে বলছিলে না ?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ। এতক্ষণে জোর শুরু হয়ে গেছে বোধহয়।

—কারা যুদ্ধ করছে ?

—এক অভিজাতবংশীয় আরেক অভিজাতের সঙ্গে। একজন সাধারণতন্ত্রের পক্ষে—অন্যজন রাজতন্ত্রের পক্ষে।

—রাজার পক্ষ ? রাজা তো নেই।

—রাজা না থাকুন। তার বাচ্ছা ছেলেটা রয়েছে না কারাগারে !

—তা বটে।

—সবচেয়ে মজা কি জানেন—এই যে দুই অভিজাত বংশীয়—একে অন্যের টুঁটি ছিঁড়বার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, এরা কিন্তু ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। একজন বুড়ো, একজন বয়সে ছোকরা। ভাইপোর ছেলে আর ঠাকুর্দার ভাই। বৃদ্ধ সাদার দলের সেনাপতি, নাতি নীলের দলের সেনাধ্যক্ষ। ধরতে পারলে কেউ কাউকে ছাড়বে না। মরণপণ লড়াই।

—মরণ পণ ?

—বলছি কি। নাতি-ঠাকুর্দা কেউ কাউকে ছাড়বে না—এমনি রাগ।

আগন্তুক নিজের মনেই বলে চললেন—শুধু গৃহযুদ্ধ নয়, একেবারে পারিবারিক যুদ্ধ। ভালো। একটা জাতির নতুন করে জেগে ওঠার পথটা সত্যিই অনেক বন্ধুর।

প্রকাশ্যে বললেন—'নাতি-ঠাকুর্দার মধ্যে জিতছে কে ?'

—এখনো পর্যন্ত নাতি। কিন্তু ঠাকুর্দাও কম যায় না। এরা কে জানেন ? এই অঞ্চলের সবচেয়ে অভিজাত বংশ হচ্ছে জোভেঁ বংশ। এরা সেই বংশেরই দু'টো ধারা। ঠাকুর্দা—মাকুর্ইস দ্য লাঁতেনা ; নাতির নাম ভাইকাউন্ট জোভেঁ।

—ওঃ।

—মজা দেখুন, একটা গাছের যখন তু'টো শাখা থাকে, তখন তারা কিন্তু পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, কিংবা নিজেরা নিজেদের মতো বেড়ে ওঠে, তাই বলে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে না। কিন্তু মানুষের বংশ দেখুন—তু'টো ধারা থাকলে নিজেরা মারামারি, লাঠালাঠি করবেই।

আগন্তুক চুপ করে রইলেন।

—যাকগে। আপনি কিছু খাবেন না?

—আমার কাছে রুটি আছে। কিন্তু ডলে কি হচ্ছে তাতো বললে না?

—বলি। লাঁতেনা চাইছেন সমুদ্র দিয়ে ইংরেজদের নিয়ে আসতে। কিন্তু সমস্ত উপকূলটা তো জোভেঁর দখলে। ল াঁতেনাকে তিনি দেশের ভিতরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, পাশাপাশি ইংরেজদের হটিয়ে দিচ্ছেন সমুদ্রের গভীরে। লাঁতেনা পন্টরসন দখল করেছিলেন, জোভেঁ তাঁকে দূর করে দিলেন। লাঁতেনা বুদ্ধি করে তাই গিয়ে পড়লেন ডলের উপর। যদি ডল দখল করে ডলের পাহাড়ে কামান বসাতে পারেন তবে ইংরেজদের এদেশে ঢোকা আটকায় কে? তাই লাঁতেনা ছুটেছেন ডলের দিকে, জোভেঁও গিয়ে পড়েছেন লাঁতেনার উপর। একটা সেকেণ্ড দেরি করেন নি, কারোর হুকুমের তোয়াক্কা করেন নি—নিজে যা ভালো বুঝেছেন তাই করেছেন। সত্যি এমন সাহস আর এমন বুদ্ধি!

—ডল পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগে?

—কামান নিয়ে যেতে হলে তিনঘণ্টা তো বটেই।

কান খাড়া করলেন আগন্তুক। তারপর বললেন—

—কামানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মনে হয়।

সরাইওয়ালাও একটুক্ষণ কান পেতে শুনল—

—হ্যাঁ—কামানই তো বটে। বন্দুকও আছে সঙ্গে মনে হয়।

তাহলে যুদ্ধ জোর লেগে গেছে। রাতটা আপনার এখানেই কাটানো দরকার। ওখানে গেলে বিপদে পড়বেন।

—থাকার কোনো উপায়ই নেই। যেতে আমাকে হবেই।

—ঠিক করছেন না। কি এতো দরকার? জানি না অবশ্য। কিন্তু ওখানে বিপদের ভয় খুবই। খুব প্রিয়বস্তু বিপন্ন না হলে—

—প্রিয়বস্তু! প্রিয়তম। তার থেকে বেশী কিছু থাকলে তাই।

—ছেলে?

—একরকম তাই!

সরাইওয়ালা মনে মনে ভাবল—দেখতে তো ইনি যাজকের মতো, অবশ্য যাজকেরও ছেলে থাকেনা কি? অনেক সময়ে থাকে।

পথিক বললেন—'ঘোড়ার লাগাম লাগিয়ে দাও আর তোমার দামটা নিয়ে নাও।' সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিলেন আলখাল্লা পরিহিত মানুষটি।

—আপনি যখন যাবেনই, তখন একটা কথা শুনুন। আপনি যাচ্ছেন সেণ্ট ম্যালোতে তো? তাহলে ডলের পথ দিয়ে যাবেন না। এই রাস্তার মোড়ে গেলেই দু'টো পথ বেরিয়েছে। একটা ডলের মধ্য দিয়ে আরেকটা সমুদ্রের কূলে কূলে। বাঁদিকে ডল, ডানদিকে সমুদ্রকূল। আমার কথাটা দয়া করে শুনুন। ডল দিয়ে গেলে একেবারে ভয়ানক খুনোখুনির মধ্যে গিয়ে পড়বেন। বাঁয়ে একেবারেই যাবেন না—যেতেই যদি হয় তবে ডাইনে যান।

—ধন্যবাদ।—ঘোড়ায় চড়তে চড়তে পথিকের উত্তর শোনা গেল।

ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন সওয়ারী। অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে উঠেছে। ঘোড়া সেই অন্ধকারের ভিতরেই ছুটে চলে গেল।

সরাইওয়ালা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কেবল ঘোড়ার পায়ের শব্দ দ্রুত দূরে চলে যাচ্ছে এটুকু বুঝতে পারল।

ঘোড়সওয়ার রাস্তার মোড়ে এসে দেখলেন সত্যিই পথটা দু'ভাগে

ভাগ হয়ে গেছে। তার মানে সরাইওয়ালা যে বলেছে বাঁয়ে ডল, ডাইনে সমুদ্রপথ—সেটা ঠিক।

পিছনে অন্ধকার থেকে আর্ত অনুরোধ শুনতে পাচ্ছেন তিনি তখনো। সরাইওয়ালা অনুরোধ জানাচ্ছে—

—ডানদিকে যান—ডাইনে।

ঘোড়া ছুটল বাঁদিকে।

পিছনে অন্ধকার ভেদ করে তখনো সরাইওয়ালার আবেদন ভেসে আসছে—ডানদিকে—ডানদিকে যান।

## আট

তিরিশজন সৈনিকের নেতা ঝাঁকড়া গুঁফো সার্জেণ্ট লা সৌদ্রের অরণ্যে চিৎকার করে বলেছিলেন তিনটে শিশুকে ঘিরে—

—আজ থেকে হোক এরা লালটুপি পল্টনের সন্তান।

সেই তিনটি শিশুর সঙ্গে ছিল তাদের অসহায়া জননী। মিচেল ফ্লেচার্ড।

ঐ সৈন্যদল এসেছিল প্যারী থেকে। সাধারণতন্ত্রের সৈনিক।

লাঁতেনাকে নেতৃত্বে বরণ করে নিয়ে গ্যাভার্ড বলেছিলেন—

—হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল যে নীলের দল তাদের পতাকায় লেখা ছিল—লালটুপির পল্টন; ওরা নাকি এসেছিল প্যারী থেকে।

উত্তরে লাঁতেনা বলেছিলেন—'জানোয়ারের দল'। হুকুম দিয়েছিলেন আহত, বন্দী, স্ত্রীলোক সবাইকে গুলি করতে; পুড়িয়ে মারতে। আর তিনটি শিশুকে ফুজিয়ার্সের অরণ্যে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন তাঁর ভাববার সময় ছিল না।

প্যারী নগরীর সরাইখানা র‍্যু-দ্য-পাঁয়োর এর রুদ্ধদ্বার কক্ষের অধিবেশনে রোবসপিয়র প্রিওর দ্য ল্যামার্ণের পাঠানো বিবরণ পাঠ

করে সিমোর্দেকে লাঁতেনার নৃশংসতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলেন —এক তিন শিশুর মা—তাকেও লাঁতেনা গুলি করে মেরেছে। বাচ্চা তিনটির কোনো খবর নেই—

হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়ি থেকে কান্না চাপতে চাপতে বেরিয়ে আসার পথে ভিক্ষুক টেলেমার্ক দেখেছিল দু'জন রমণীর দেহ। একজন মৃতা, আরেকজন অর্ধমৃতা।

কাঁধের হাড়ভাঙা রমণীকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছিল টেলেমার্ক তার আস্তানায়। অজ্ঞাত ছিল তার কাছে ঐ রমণীর পরিচয়।

প্রিওর হ্য ল্যামার্ণ যে খবর পাঠিয়েছিলেন তা একটু অসম্পূর্ণ ছিল। আর যাইহোক তিনি তো আর টেলেমার্কের মতো স্তূপ ঘেঁটে দেখেন নি।

আমরা বরঞ্চ পণ্টরসন থেকে আবার চলে আসি ট্যানীতে টেলেমার্কের ভাঙা কুটিরে।

সুস্থ লাঁতেনার জীবন রক্ষা করেছিল টেলেমার্ক। ষাট হাজার ফ্রাঙ্ক স্বর্ণমুদ্রার কোনো প্রলোভনই তাকে মনুষ্যত্ব থেকে সরাতে পারে নি ; উপযাজক হয়ে সে বাঁচিয়েছিল লাঁতেনাকে।

টেলেমার্ককে কেউ বলেনি অজ্ঞাত পরিচয় রমণী—যার অতীত ভবিষ্যৎ কোনো কিছুই তার জানা নেই, তাকে মৃতের স্তূপ থেকে বার করে বাঁচাতে। টেলেমার্ক তার মনের নির্দেশে মুমূর্ষ রমণীকে নিয়ে এসেছিল। রমণীর বর্তমান অবস্থাটাই তার কাছে ছিল সবথেকে জরুরী।

এই রমণীই মিচেল ফ্লেচার্ড। সেই তিন শিশুর অসহায়া জননী।

মিচেলের কাঁধের হাড় বন্দুকের গুলিতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল, এছাড়া আর কোনো আঘাত লাগেনি। সেটা তার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

টেলেমার্ক গরীব। টেলেমার্ক ভিখিরি। টেলেমার্ককে জীবিকার তাগিদে পথে পথে ঘুরতে হয়। নিজের তাগিদেই সে শিখেছে বনজ

লতাপাতা দিয়ে এক হাতুড়ে চিকিচ্ছে বিত্তে। গরীব মানুষের কাছে ওই বিত্তেই জীবনদায়ী।

দীর্ঘসূত্রী সে চিকিৎসা। কিন্তু সেই চিকিৎসাতেই একসময়ে মিচেলের কাঁধের ভাঙা হাড় জোড়া লাগল, সিধে হয়ে গেল ঘাড়। দুর্বল, খুবই দুর্বল মিচেল এখনো, তবু তার নিজের চিকিৎসার এতবড় সুফল দেখে টেলেমার্কের বুকখানা গর্বে ভরে উঠল। না বলে সে পারল না—

—দেখলি তো মা, শেষ পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠলি। ঘা'টা তাহলে শুখলো, কি বল?

কিন্তু মিচেলের জবাবটা যে এমন হবে টেলেমার্ক ভাবতেও পারেনি।

—কাঁধের ঘা শুখোলেই কি মনের ঘা শুখোয়?

টেলেমার্কের উজ্জ্বল মুখটা আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে গেল। উঁচু করা মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকের উপর।

মিচেলের পরিচয় পাওয়ার পর থেকেই একটা ব্যাপারে টেলেমার্ক নীরব থেকেছে। সে শুনেছে মিচেলের তিন-তিনটে শিশুও ছিল তার সঙ্গে ঐ গোলাবাড়িতে। কিন্তু তাদের যে কি হয়েছে সে খবরটাই জানা নেই টেলেমার্কের! তাই টেলেমার্ক অসহায়া জননীকে কোনো কথাই বলেনি শিশু তিনটি সম্পর্কে। কি বলবে? কিইবা বলার আছে টেলেমার্কের। মায়ের কোলের শিশুরা আজ মায়ের কাছে নেই, তাদের খবরটুকুও জানা নেই টেলেমার্কের; তাই সে পালন করে এসেছে নীরবতা। দীর্ঘ এই চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে একেবারের জন্যও সে বাচ্চা তিনটির কথা তোলেনি।

মিচেলও খেয়াল করেছে, টেলেমার্কের এই যত্ন, এই সেবা, এই চিকিৎসা, এই ভালোবাসা, এই স্নেহ। নেহাত এক ভিক্ষাজীবী—তাও প্রাণঢালা অকৃপণ সাহায্য দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য কি কঠিন চেষ্টাই না সে করে চলেছে। কিন্তু নিজে থেকে কখনো টেলেমার্ক তার জীবন-সলতে, তার আঁধার জীবনের দীপের আলো

তিন-তিনটি ছোট্ট শিশু—রেঁণিজা—গ্রয়েলেন—জর্জেট—তাদের কথা একবারও বলেনি। কেন বলেনি?

মিচেলের অন্তর—মায়ের অন্তর। অমঙ্গল আশঙ্কায় সেটা পূর্ণ হয়ে রয়েছে। বারবারই সে ভেবেছে টেলেমার্ককে জিজ্ঞাসা করে তার বাচ্ছাদের কথা, কিন্তু বারবারই নিজেই নিজেকে চুপ করিয়ে দিয়েছে। যেটা আশঙ্কা তার মনে মনে, টেলেমার্ককে জিজ্ঞাসা করলে যদি সেটাই সত্য হয়ে বেরিয়ে আসে—তখন সে—মিচেল—এক মা, কি করে সহ্য করবে সেই চরম সংবাদ। তাই টেলেমার্কও এতদিন চুপ, মিচেলও এতদিন চুপ।

কিন্তু আজ যখন টেলেমার্ক অন্য কিছু ভুলে প্রায় সুস্থ মিচেলের কাছে তার সরল গর্ব প্রকাশ করে ফেলেছে—তখন মিচেলও আর পারল না নিজেকে চুপ করিয়ে রাখতে।

হাত ধরে নিয়ে এসে বাইরে বসিয়ে দিয়েছে তাকে টেলেমার্ক। আনন্দে উজ্জ্বল বুড়োর মুখে। সেই মুখটাকেই কালো করে দিয়েছে মিচেল।

কিন্তু মিচেলই বা করে কি! সে যে মা। মনকে আর কতদিন সান্ত্বনা দিয়ে সে রাখবে? সে বেঁচে উঠেছে! কিন্তু তার কাছে এ বাঁচার তো কোনো অর্থই নেই, যতক্ষণ না তার সন্তানদের সে ফিরে পায়! কিন্তু কোথায় তার সন্তানরা? আদৌ কি আছে কোথাও তারা?

তার ভিতরটা যে যন্ত্রণায়, আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। তাই আর সে পারল না—বুড়োকে জিজ্ঞাসাই করে ফেলল।

—তুমি কি তাদের কথা কিছুই জান না?—করুণ আকুতি মায়ের চোখে?

—কাদের? কাদের কথা বলছিস তুই?—বুঝেও না বোঝার ব্যর্থ অভিনয় করার চেষ্টা করে বেচারি টেলেমার্ক।

—কেন? আমার দুধের বাছাদের। আমার কোলজোড়া তিন-

তিনটে বাচ্ছা—রেঁনিজাঁ—গ্রয়েলেন—জর্জেট। ওগো ছোট্টটা যে এখনো বুকের দুধ খায়।—কান্নায় গলাটা বুজে গেল মিচেলের।

কতক্ষণ আর অভিনয় করবে ঐ টেলেমার্ক? যে মানুষটা কেবল ভিক্ষে করে সহজ সত্যভাবে!

সে শুনেছে। একেবারে শোনেনি যে তা নয়, শুনেছে। শুনেছে যে তিনটি শিশু—তার মধ্যে একটি মায়ের বুকের দুধ ছাড়েনি তখনো; —তিনটি শিশুর দু'টি ছেলে, একটি মেয়ে; তারা ছিল ঐ গোলা-বাড়িতেই, নীলের দলের আশ্রয়ে। গোলাবাড়িতে আগুন দিয়ে সবাইকে গুলি করে মেরে মার্কুইস আর সৈন্যরা নিয়ে গেছে তিনটে বাচ্ছাকেই—কোথায় কে জানে? এখান থেকে দূরে—বহুদূরে, এইটুকুই সে শুনেছে। তারপর ঐ নৃশংস লাঁতেনা তাদের নিয়ে কি করেছেন কে জানে? তারা বেঁচে আছে কিনা সেটুকুও তো কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু মায়ের কোলের সন্তানেরা হারিয়ে গেছে, তাদের কি হয়েছে, কেউ জানেনা—এই খবরটা কিভাবে একজন মাকে জানাতে হয়—জানাতে পারা যায়—সেটা তো কোনোদিন শেখেনি টেলেমার্ক!

—আমার দুধের বাছারা!—মায়ের আর্ত কান্নাতে চিকিৎসায় সফল বৃদ্ধ ভিখারির মাথাটা ঝুলে পড়ল। তার এই সফলতার কি দাম আছে এক সন্তানহারা জননীর কাছে!

—তুমি কি কিছুই জাননা?—মায়ের গলার স্বরে কান্না মেশানো রাগ।

টেলেমার্কের পাকাচুল মাথাটা আরো ঝুলে পড়ল। আসলে মনে মনে সে শিশু তিনটির হারিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকেই দায়ী করছে। ভাবছিল—'আচ্ছা লাঁতেনার মনের কোনো কোণায় কি এই মুহূর্তে টেলেমার্ক বলে এক ভিখিরির নামটার স্থান আছে!'

নীরব টেলেমার্কের মনটা তোলপাড় হয়ে উঠছে।—'বড়লোক বড়লোক সব। নিজের বিপদে তোমায় চিনবে, বিপদ কেটে গেলে

তোমায় চিনবেই না। স্বার্থপর।' আবারো ভাবে টেলেমার্ক—আবারো অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—'ওঃ! কেন বাঁচাতে গেলাম ঐ বড়লোকটাকে—কেন?'—নিজেই আবার নিজের মনকে জবাব দেয়—'ও-ও তো মানুষ। অসহায় একটা মানুষ—তাকে বাঁচাব না!' তারপর একটা তেতো জল গলা দিয়ে উঠে আসে তার—'হায়। আগে যদি জানতাম!'

টেলেমার্ক ভাবে। ভাবে আর ভাবে। সে তো একটা সৎকাজ করতে চেয়েছিল, করেওছে। একজন প্রাণভয়ে ভীত মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে, বাঁচিয়েছে। কিন্তু তার ফল এই রকম মারাত্মক হবে সে কি করে জানবে? একজন অসহায় মানুষ জীবন ফিরে পেয়ে অসংখ্য মানুষের জীবনহানি ঘটাবে—এটা টেলেমার্ক কি করে বুঝবে? কি করে সে জানবে যে আগের রাতের অসহায় মানুষটা—যার মাথার দামটাই যাট হাজার ফ্রাঙ্ক—তাও নগদ সোনায়—তাকে বাঁচালে পুরো গ্রামটা সে জ্বালিয়ে দেবে, গুলি করে মারবে শ'য়ে শ'য়ে লোককে, কোথায় নিরুদ্দেশ করে দেবে তিন-তিনটে অসহায় শিশুকে!

কিন্তু পরোক্ষে সেই তো এতগুলো মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে দাঁড়াল। এখন কি করে টেলেমার্ক? একটা আহত নেকড়েকে যে বাঁচায় সে তো অসংখ্য মেষ নিধনের কারণ হয়ে যায়, যে একটা ডানাভাঙা বাজপাখিকে বাঁচায় সে যে অগণিত পায়রার মৃত্যুর কারণ হয়। এগুলো তো অপরাধ—সেও তো তাহলে অপরাধ করেছে, সেও তো অপরাধী। একজন মানুষকে বাঁচিয়ে সে কত মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়ে উঠল—! এ কি অপরাধ সে করে ফেলেছে!

তবু—তবু তারই মধ্যে একটুখানি পুণ্যের কাজ সে করেছে—এই অসহায়া মায়ের জীবনটাতো সে ফিরিয়ে দিতে পেরেছে। কিন্তু তার সেই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্ছাগুলি?

হায়। বৃদ্ধ ভিখিরি টেলেমার্ক। তার সরল বুদ্ধিতে ভাবনার

আর শেষ নেই, কূল নেই, কিনারা নেই। কি করবে? সে কি করবে?

—এইভাবে চুপ করে থেকে তো ব্যাপারটার মীমাংসা হবে না—আমি তো এইভাবে এটা মেনে নিতে পারব না—মায়ের গলা।

টেলেমার্ক বিমূঢ়। কোনো ভাবে আলোচনাটা চাপা দিতে চায় সে। তাই যেন একটু জোরের সঙ্গেই নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে বলে ওঠে—'চুপ। একদম চুপ।'

—কি করে চুপ করব? কি ভাবে চুপ করব? সন্তানের জ্বালা যে কি জ্বালা সে তুমি কি করে জানবে বল? তোমার তো কোনোদিন সন্তান ছিল না—ছিল কি?—টেলেমার্কের ভাষাহীন মুখটার দিকে তাকিয়ে বলে চলে মিচেল,—'ছিল না। এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ। যেটা তুমি নিজেই জান না সেটার উপর তুমি তোমার রায় দেবে কি ভাবে? সন্তানের ব্যথাটাই তুমি বোঝ না, সে ব্যথায় তুমি আমাকে কি করে সান্ত্বনা দেবে? তুমি—তুমি আমায় কেন বাঁচালে?—'

এ প্রশ্নেরই বা কি জবাব দেবে টেলেমার্ক?

—আমি, আমি তোমার উপর ভীষণ রেগে আছি। তুমি যদি আমায় না বাঁচাতে তবে আমি মরতাম। আর তাহলে—তাহলে আমি আমার বাছাদের দেখতে পেতাম। তারা বেঁচে থাকলেও পেতাম, মারা গেলেও পেতাম। আর মৃতরা তো জীবিতদের রক্ষাও করতে পারে। আমার ছেলেমেয়েরা যদি—যদি বেঁচে নাই থেকে থাকে তবে আমি মরে গিয়েও তো তাদের সঙ্গে মিলতে পারতাম, আর যদি ওরা বেঁচে থাকে তবেও তো আমি মরে গিয়ে ওদের দেখতে পেতাম, বিপদে রক্ষা করতে পারতাম। হায়! তুমি আমার এতবড় ক্ষতিটা কেন করলে? কেন—কেন?—ভীষণ উত্তেজনায় অসুস্থ মিচেল কাঁপছে।

টেলেমার্ক তার হাত ধরল।

—চুপ কর মা—চুপ কর। না হলে আবার জ্বর আসবে।

টেলেমার্ক তার হাত ধরল···পৃষ্ঠা-৮২

গ্রাহ্যই করল না মিচেল টেলেমার্ককে। বরঞ্চ কর্কশ স্বরে বলল,—'আমি এখান থেকে কবে চলে যেতে পারব?'

—চলে যেতে?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ। পায়ে হেঁটে চলে যেতে।

—কোনোদিনই না, যদি না—

—কি যদি না—?

—যদি না আমার কথা শুনে চলিস।

—কথা শুনে মানে?

—মানে ঠাণ্ডা হয়ে থাক। ঠাণ্ডা হয়ে থাকলে কালই চলে যেতে পারবি, না হলে কোনোদিনই নয়।

—ঠাণ্ডা? ঠাণ্ডা বলতে কি বোঝাতে চাইছ?

—ভগবানের উপর নির্ভর করে থাকা।

—ভগবান !!! ভগবান আমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কি করলেন?

টেলেমার্ক কি উত্তর দেবে? এ প্রশ্নের কি জবাব আছে?

—তুমি ভেবে দেখ, তোমার কোনোদিন ছেলেমেয়ে ছিল না। তাছাড়া তুমি তো মা নয়। মায়ের কাছে সন্তানের থেকে আর কি বড় হতে পারে? আমার কাছে ঐ ছেলেমেয়েরাই তো সব ছিল। আর সন্তান নেই যে মায়ের—সে আবার মা কিসের? আর সেই সন্তানরা আমার কাছে নেই। কেন নেই? কি জবাব দেবে? আমার কোনো প্রশ্নের জবাবই তো কেউ দেয় না। আমার স্বামীকে কে যেন গুলি করে মারল—কেন?—জবাব নেই। আমাকে ওরা গুলি করল। কেন?—কোনো জবাব নেই।—আশ্চর্য!

—চুপ কর মা—চুপ কর; লক্ষ্মী সোনা মা আমার এখনকার মতো চুপ কর। নইলে এক্ষুনি আবার জ্বর হবে, আবার তুই অসুখে পড়বি।

মিচেল হঠাৎই চুপ করে গেল। দৃষ্টিটা টেলেমার্কের দিকে, কিন্তু টেলেমার্ক বুঝল তার মনটা চকিতেই অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে।

নয়

সরাইওয়ালা ভুল খবর দেয়নি।

ডল। সমুদ্র উপকূলে ফ্রান্সের একটি ছোট শহর। ডলের বিশেষত্ব হচ্ছে উপকূলে আছে পাহাড়। সেই ডলেই সে রাতে চলেছে ভয়ানক যুদ্ধ। ভীষণ লড়াই—ভীষণ।

সকালে এসেছে সাদার দল। সন্ধ্যেয় হানা দিল নীলেরা। কিন্তু সংখ্যায় অনেক তারতম্য।

সাদারা ছ' হাজার—সঙ্গে ষোলটা কামান।

নীলেরা মাত্র দেড়হাজার—তিনটে কামান আছে তাদের।

সাদাদের দলপতি বহু যুদ্ধের ধুরন্ধর সেনানায়ক বৃদ্ধ মার্কুইস-দ্য ল'াতেনা।

নীলের সেনাধ্যক্ষ বহু উল্লিখিত তরুণ জোভেঁ।

সাদারা সংখ্যায় অনেক; সে তুলনায় নীলেরা অনেক কম—এক চতুর্থাংশ।

হিংস্রতায় দু'পক্ষই সমান। দুই দলই পরস্পরের ধ্বংস কামনায় উন্মুখ। কিন্তু সংখ্যা দিয়েই সব সময়ে কাজ হয় না।

সাদারা নামেই সৈন্য। পোশাকে আশাকে, চাল চলনে, ব্যবহারে সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর কোন বৈশিষ্ট্যই তাদের নেই বলা যায়।

আসলে এরা মূলত ভেণ্ডির কৃষক। কোনো প্রশিক্ষণই তাদের হয়নি। গলায় মন্ত্রপূত জপমালা, গোলটুপিতে সাদা ফিতে, হাতে তরবারির বদলে শাবল; যাদের বন্দুক আছে তাদের আবার সঙ্গীন জোটেনি। কামান আছে, কিন্তু টানা হচ্ছে দড়ি দিয়ে।

অন্য দিকে নীলের দল!

পুরোপুরি একটা সুশৃঙ্খল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ সৈন্যদল। পোশাক

ঝকঝকে, তরওয়াল সুতীক্ষ্ণ, প্রত্যেকটি বন্দুক সঙ্গীন যুক্ত। আজ্ঞাবহ, এবং হিংস্র। আদেশ পালনে তাদের সুনাম আছে; এতখানিই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে প্রয়োজনে অন্যকে আদেশ দিতেও জানে।

কথায় আছে সৈন্যদল যখন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে তারা হয়ে পড়ে জনতা।

সাদার দল সেদিক দিয়ে জনতা, সৈন্যদল বলতে নীলদেরই বোঝায়।

এই ধরনের অর্ধপ্রশিক্ষিত, অর্ধঅস্ত্রধারী, প্রায় শৃঙ্খলাহীন ছ'হাজার সৈন্য নিয়ে লাঁতেনা যুদ্ধ করছেন রাজতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য।

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বহু যুদ্ধের সফল নায়ক লাঁতেনা যুদ্ধ করছেন আর বুঝতে পারছেন—রাজভক্ত, দেশপ্রেমী এই সৈন্যদলকে দিয়ে অনেক কিছুই করিয়ে নেওয়া যেতে পারে যদি তাদের সামনে থাকে সত্যিকারের প্রশিক্ষিত একদল সেনাবাহিনী। তাহলেই এই বিদ্রোহী কৃষকরাই সংখ্যাধিক্যের জোরে আর শিক্ষিত সেনাবাহিনীর অনুসরণে হয়ে উঠবে অজেয়, দুর্দম। কিন্তু সে ধরনের সুশিক্ষিত সৈন্যদল তিনি পাচ্ছেন কোথায়, যাদের সঙ্গে থেকে, যাদের অনুসরণ করে তাঁর নিজস্ব বাহিনীও হয়ে উঠবে আদর্শ।

অনেক ভেবে দেখেছেন লাঁতেনা; একমাত্র ইংরেজ সৈন্যদলের মধ্য থেকেই তিনি পেতে পারেন সেই ঈপ্সিত বাহিনী। তাই তিনি গোড়া থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছেন কিভাবে ইংরেজ সৈন্যদলকে ফরাসী মাটিতে নামিয়ে আনানো যায়। দরকার কেবল একটা জায়গা—সমুদ্র উপকূলে একটা ঘাঁটি—যেটায় আপাতত ইংরেজরা অবতরণ করবে—যেটা আপাতত ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে হবে—তাহলেই কেল্লা ফতে। তাঁর বিদ্রোহী সেনারাই পরে রাজতন্ত্রের পতাকাকে ফ্রান্সের সর্বত্র বহন করে নিয়ে যাবে।

কিন্তু সেই জায়গাটা আর তিনি কোনোমতেই দখল করতে পারছেন না। পারছেন না ঐ দেড়হাজারি সেনাদলের নায়ক জোভেঁর জন্য।

জোভেঁ। লাঁতেনার ভাইপোর ছেলে। নাতি। উত্তরাধিকারী হীন লাঁতেনার একমাত্র বংশধর বলতে জোভেঁ। জোভেঁর অতি শৈশব থেকেই সে লাঁতেনার তত্ত্বাবধানে বড় হয়েছে, হয়ে এখন গেছে রাজতন্ত্রের বিপক্ষে, সাধারণতন্ত্রের পক্ষে! সাধারণতন্ত্র—ফুঃ। লাঁতেনার সমস্ত ঘৃণা আর ধিক্কার কার উপর—সাধারণতন্ত্রের উপর না জোভেঁর উপর! ক্রোধ তাই সীমা পরিসীমা মানতে চায় না। দিনের মধ্যে লাঁতেনা তাই সাতবার হলফ নেন—'দাঁড়াও ধরি তোমাকে একবার, তারপর গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।'

কিন্তু দুর্ভাগ্য লাঁতেনার জোভেঁকে তিনি ধরা তো দূরে থাক, জোভেঁর হাতেই বারবার হেরে যাচ্ছেন।

ফরাসী বিপ্লবের দিনে অজস্র নতুন নতুন নায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল। জোভেঁর আবির্ভাবও তেমনি একটা ঘটনা।

জোভেঁর বয়স তিরিশ বছরের কোঠায়। গ্রীক পুরাণের হারকিউলিসের মতো পেশীবহুল তাঁর চেহারা, কিন্তু চোখ দু'টি স্বপ্নমাখা। মুখের মধ্যে শিশুর সারল্য। কোনো নেশা নেই—এমন কি ধূমপানও না। কোনোরকম শপথ নেন না, অথচ কথা মানেই সেটা বেদবাক্য। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। সঙ্গে থাকে একটি ছোট বাক্স মতো, তাতে থাকে তাঁর দাঁত-নখ-চুল পরিষ্কার করার সরঞ্জাম। বিশ্রামের সময়ে নিজের হাতে নিজের কোটের ধুলো ঝেড়ে নেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে সঙ্কটময় জায়গায় তাঁকে দেখা যায় প্রতিনিয়ত—অথচ কোনোদিন তাঁকে কেউ অস্ত্রাঘাত করতে পারেনি। সৈন্যদল আর একটি শিক্ষা তাঁর কাছে পেয়েছে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—তুষারপাত বা ঝড় যে সময়েই হোক, যে অবস্থাতেই হোক গায়ের আঙ্গরাখাটি মাটিতে পেতে তিনি রাতে ঘুমোন।

এই জোভেঁ। বীর-নিষ্পাপ। এই যে কোমলতা—মুহূর্তে

অন্তর্হিত হয় তাঁর হাতে তরবারি উঠলেই। তাঁর তেজস্বিতা সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করে প্রতিদিন।

সর্বোপরি ভাবুক ও দার্শনিক। যেন এক তরুণ ঋষি, অথচ ইন্দ্রের মতোই বজ্র যেন তাঁর অধীন।

জোভেঁর এই দেড়হাজারি সৈন্যবাহিনী হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এতে ছিল পদাতিক, অশ্বারোহী, ছিল গুপ্তচর, ছিল অগ্রদূত, এমনকি তিনটি কামান। জোভেঁর বাহিনী জোভেঁরই—তাঁরই তৈরি করা, তাঁরই প্রশিক্ষণে এরা দুর্দম।

লাঁতেনার অভিজ্ঞতা অনেক অনেক বেশী। তার ফলে তিনি অনেক সাবধানী এবং সাহসীও বটে। সাধারণত যুদ্ধের ক্ষেত্রে বৃদ্ধেরা তরুণদের থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। রক্তের মধ্যে তরুণদের মতো তাঁদের চঞ্চলতা থাকে না, কিন্তু অনেক অনেক দুঃসাহসী হন তাঁরা। কেননা মৃত্যুর হাতছানি তো তাঁরা পেয়েই গেছেন—হারাবার ভয় তো তাঁদের কিছুই থাকে না। ফলে নিপুণ এবং হঠকারি—এই দুই বৈপরীত্য মিলিয়ে বৃদ্ধ সেনাপতিদের করে তোলে অজেয়।

সুতরাং লাঁতেনারই জয়ের সম্ভাবনা বেশী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য।

একের পর এক যুদ্ধে তাঁর পরাজয় বাড়ছে। জোভেঁ তাঁকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। আর লাঁতেনার বাড়ছে ক্রোধ—জোভেঁর উপর ; বাড়ছে প্রতিজ্ঞা—যেন তেন প্রকারে ইংরেজদের নামিয়ে আনতে হবে ফরাসী-মাটিতে।

অনেক ভেবে তাই লাঁতেনা ডল জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন। ডল সাধারণতন্ত্রীদের সুরক্ষার আওতায় ছিল না। ডল সমুদ্র উপকূলে। ডলে পাহাড় আছে। পাহাড়ে একবার কামান বসাতে পারলেই ইংরেজদের জন্য সমুদ্র উপকূল তাঁর অধীনে। এই সব ভেবে সেদিন সকালে ছ'হাজার সৈন্য নিয়ে আচমকাই তিনি হানা দিলেন ডলের উপর।

লাঁতেনার নির্মম, প্রতিহিংসাপরায়ণ স্বভাবের কথা মানুষের রাতের দুঃস্বপ্ন। যেই মাত্র সাদার দল ডলে এসে পৌঁছোল,—ভীত সন্ত্রস্ত ডলবাসীরা কোনো বাধা দেবার চেষ্টাই করল না। নগরের মানুষ ঝড়ের গতিতে নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ফলে প্রতিবন্ধকহীন জয়ে পুলকিত ভেণ্ডির ছ'হাজার সৈন্য পরম আনন্দে ডলে আস্তানা গাড়ল। গাড়ল—আস্তানাই। সুশিক্ষিত সৈন্যদের মতো তাঁবু ফেলা নয়, শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনীর মতো সজাগ আয়োজন নয়, এ যেন গ্রাম থেকে আসা কৃষকদের মেলা। যে যেখানে পারল—একা, ছোট ছোট দলে গড়িয়ে পড়ল, কেউ বা রান্নায় বসে গেল, কেউ বা খেলায় মত্ত হয়ে পড়ল, কেউ বা জপমালা ঘুরিয়ে ধর্মের কাজটা একটু এগিয়ে রাখতে চাইল। মোচ্ছব বাড়িতে যেন বেড়াতে এসেছে সব !

লাঁতেনা ডল শহর দখল করেই গোলন্দাজ যে ক'জন তাদের নিয়ে চলে গেছেন ডল পাহাড়ে, কামান বসাবার জায়গা ঠিক করতে। সৈন্য দলের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন যাকে তার পিতৃদত্ত নাম একটা ছিল —গোজে-লা-ব্রয়াঁ।

কিন্তু ঐ নামটা সবাই ভুলেই গেছে। কেউ বলে—ব্রিস্‌বলু, মানে দেশপ্রেমিক ঘাতক ; কেউ বলে—ইমেনু, মানে বীভৎস। নিষ্ঠুরতায় ইমেনু এতোই ভয়ঙ্কর যে তার নামই ও অঞ্চলের মানুষকে ভয়ে শিউরে তুলত। যুদ্ধে সে শয়তান, যুদ্ধের পরও সে শয়তান—নরহত্যায় তার আনন্দ অসীম। সাধারণ মানুষের কাছে সে দানবের মতোই—।

এই নিষ্ঠুরতার জন্যই লাঁতেনা তাকে ভরসা করতেন। কিন্তু যুদ্ধ বিদ্যার কথা ভাবলে লাঁতেনার মতো যুদ্ধ বিশারদের পক্ষে ইমেনুর উপর ভরসা করা কতটা সঠিক ছিল সেটাও ভাবার।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। লাঁতেনা ফিরছেন। কামান বসাবার জায়গাটা তাঁর পছন্দ হয়েছে।

সেই কামান বসাবার কথা ভাবতে ভাবতেই আসছিলেন তিনি।

এমনি সময়ে—কামানেরই শব্দ। আর সামনে দেখলেন—প্রধান পথে লাল ধোঁয়া। অতর্কিতে কেউ আক্রমণ করেছে; শহরে যুদ্ধ হচ্ছে।

লাঁতেনা—বহু যুদ্ধের নায়ক লাঁতেনা! যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি কখনোই চমকান না, বিস্মিত হন না। এখন কিন্তু একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। এরকম কিছুর জন্য তিনি আদৌ তৈরী ছিলেন না।

এ শত্রু কে? কোথা থেকে এল? জোভেঁ—না—জোভেঁ তো হতে পারে না। সংখ্যায় চারগুণ সৈন্যকে কেউ কি আক্রমণ করে! তাহলে কি লেচেল? কিন্তু লেচেল তো এখান থেকে ষাট মাইল দূরে। অসম্ভব। লেচেল নয়। কিন্তু আরো অসম্ভব জোভেঁ। তাহলে? লাঁতেনার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তিনি ঘোড়া ছোটালেন। পথে পেলেন সাধারণ মানুষ—দলে-দলে পালাচ্ছে। এদের কিছু জিজ্ঞাসা করার কোনো মানেই হয় না। তাঁর ঘোড়া ছুটছে তীব্র বেগে। সেই অবস্থাতেই তিনি শুনলেন—'নীলের দল, নীলের দল।'

ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির মধ্যে তিনি শহরে ঢুকলেন।

লাঁতেনা চলে গেছেন ডল পাহাড়ে। সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। ভেণ্ডির দল যে যেখানে পারল শুয়ে পড়ল। আর শুয়ে পড়ামাত্রই ঘুম। গাঢ় ঘুম। যারা তখনো আধো আধো ঘুমে আচ্ছন্ন তারা হঠাৎই দেখল রাস্তার মোড় ঘুরে তিনটে কামান আসছে। আচ্ছন্ন অবস্থাতেই জড়িয়ে জড়িয়ে তারা প্রশ্ন করল —কে যায়?

উত্তর এল কামানের গোলায়।

ব্যস্। অবস্থা ভয়ঙ্কর। ঘুমিয়েছিল তারার আলো দেখতে দেখতে, জেগে উঠল কামানের আগুনে। চরম বিশৃঙ্খলা—পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকল ভেণ্ডিরা। সৈন্যরা খোঁজে তাদের নেতাদের, সৈন্যাধ্যক্ষ খোঁজে সেনাদের। ইতস্তত লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটতে গিয়ে পায়ে জড়াজড়ি করে তারা উল্টে পড়ে। তারই মধ্যে কামানের গোলায় একজন বা বহুজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কোনোরকমে যারা অস্ত্র হাতে

পেল তারা গুলি চালাল, তরবারি ঘোরাল—কিন্তু মরল নিজেদের লোকেরাই। অন্ধকারে শত্রু যে কে—তাই ঠিক করতে পারছে না ভেণ্ডির দল।

সাধারণ মানুষের অবস্থা আরো কাহিল। প্রতিবেশীর নাম ধরে চেঁচায়, ঘরের দরজা খুলে ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বেরিয়ে লক্ষ্যহীন ভাবে ছুটে পালাতে চেষ্টা করে—জড়াজড়ি করে উল্টে পড়ে। এক অভাবনীয় মারণ যজ্ঞ; তার মধ্যে অবলা নারী আর শিশুরা গেছে মিশে।

পথের মধ্যে পড়ে থাকা কামান আর মাল বওয়া গাড়িগুলো আরো বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। প্রচণ্ড অন্ধকার, তারই মাঝে বিপক্ষ দলের কামান আর বন্দুকের গুলির আগুন অন্ধকারকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিচ্ছে।

জোভেঁ অমিতবিক্রমে আক্রমণ করেছেন। করেছেন নিজের সাহসের উপর ভর করেই। জোভেঁ আর কি করে জানবেন যে এই মুহূর্তে লাঁতেনা নেই শহরে।

আক্রান্ত, বিশৃঙ্খল ভেণ্ডির সৈন্যরা অনেক দেরীতে হলেও একসময়ে নিজেদের গুছিয়ে নিল। হাজার হলেও তারাও তো বেশ কিছুকাল ধরে যুদ্ধ করছে! প্রাথমিক হতভম্ব ভাব কাটিয়ে ভেণ্ডির দল ধীরে ধীরে বাজারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বাজারে অনেক থাম। তারই আড়াল থেকে তারা এবার পাল্টা গুলি চালাচ্ছে। জোভেঁ একটু অসুবিধেতেই পড়লেন। কেননা সাদার দল ততক্ষণে আত্মরক্ষার জন্য জায়গা খুঁজে নিয়েছে, ফলে আক্রমণ করাও তাদের পক্ষে সহজ। তবু জোভেঁ অনেক বেশী নিশ্চিত—জয় তাঁর হবেই।

কেন?

কেননা জোভেঁ খেয়াল করেছেন লাঁতেনার কামান নীরব। জোভেঁ খবর রাখেন লাঁতেনার কামান আছে ষোলটা। কিন্তু সে কামান এতক্ষণ একবারও গর্জায়নি। কারণটা জোভেঁর জানা নেই। জানা নেই যে লাঁতেনা নেই শহরে, নেই একজনও গোলন্দাজ—তাই লাঁতেনার

কামান চুপচাপ। কিন্তু কারণ না জানা থাকলেও পরিস্থিতি এতো ঘোরাল হওয়া সত্ত্বেও কামান যখন ওদের গর্জাচ্ছে না, জোভেঁর জয় তখন অনেক নিশ্চিত; কেননা যাদের কামান সচল তাদের শক্তি বেশী।

কিন্তু জোভেঁর সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট।

হঠাৎ কামানের গর্জন। একটা গোলা।

দ্বিতীয় গোলাটা ঢুকে গেল জোভেঁর পাশের দেওয়ালটায়।

তৃতীয় গোলাটা জোভেঁর টুপিটাকে ছিটকে দিয়ে চলে গেল।

একজন সৈনিক এসে জোভেঁর পাশের মশালটা দ্রুত নিভিয়ে দিল। মুখে বলল,—

—কামান ছোঁড়া হচ্ছে কেবল আপনাকে লক্ষ্য করেই।

অন্ধকারে জোভেঁ আড়াল হয়ে গেলেন। অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে মাথার টুপিটা আবার পরে নিলেন।

যুদ্ধের গতি যে আর একতরফা নেই, সেটা বুঝতে জোভেঁর সময় লাগল না। এতক্ষণ যে কামান নীরব ছিল—সেই কামান গর্জাচ্ছে। সুতরাং নীলের দলকে এবার আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। কিন্তু জোভেঁকে মারার জন্যই কেবল কামানের লক্ষ্য কেন? কে চাইছে ঠিক জোভেঁকেই মারতে?

গোলন্দাজ স্বয়ং লাঁতেনা।

ঘোড়া ছুটিয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে তিনি বাজারের পিছন দিয়ে এসে ঢুকেছেন রণস্থলে। তাঁকে দেখে ইমেনু ধড়ে প্রাণ পেল। ছুটে এসে বলল—

—আমরা আক্রান্ত। নীলের দল আক্রমণ করেছে।

—সে তো দেখছিই। কিন্তু এরা কারা?

—বুঝতে পারছি না।

—ভিনানের রাস্তা খোলা না বন্ধ?

—সম্ভবত খোলা।

—সেই পথেই তাহলে পিছু হট।

—শুরু করেছি। অনেকেই পালিয়েছে ও পথে।

—কি? পালানো? পালানো চলবে না। পিছু হট শৃঙ্খলা-বদ্ধ হয়ে। পিছু হটে একত্রিত হও। এতক্ষণ কামান চালাওনি কেন?

—সব গোলন্দাজ তো আপনার সঙ্গে গিয়েছিল—তাই।

—ওঃ। ঠিক আছে। এখন তো আমিই এসে গেছি।

—ফুজিয়ার্সের দিকে মালপত্র এবং প্রয়োজনীয় জিনিস সব পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেই বাচ্ছা তিনটেকে নিয়ে কি করব বুঝতে পারছি না।

—ওঃ। সেই তিনটে বাচ্ছা!

আঁজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওরাই দাবার বোড়ে। ওদের লা টুর্গে পাঠাও।

বলতে বলতে ছুটলেন মার্কুইস। সেনাপতি আসার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের চেহারাই পাল্টে গেল। জায়গাটা সঙ্কীর্ণ। মাত্র দু'টো কামান বসাতে পারা গেছে। মার্কুইস নিজে একটা কামানের সামনে দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেলেন—মশালের আলোয় প্রতিভাত একটি মুখ—আর কেউ নয়—স্বয়ং জোভেঁ।

—পেয়েছি।—পরম উৎসাহে কামান দাগলেন মার্কুইস। এক—দুই—তিন। তিনবারই বিফল। তৃতীয়বারে কেবল জোভেঁর টুপিটা ছুঁতে পেরেছেন। এসময়েই মশালটা নিভে গেল।

—যাঃ।—লাঁতেনা, মার্কুইস দ্য লাঁতেনা হতাশ।

ওদিকে তখন দু'পক্ষে তুমুল গোলাবর্ষণ হচ্ছে।

অন্ধকারে টুপিটা পরে জোভেঁ কিছুক্ষণ ভাবলেন। বুদ্ধির খেলা দেখাতে হবে। রণকৌশল চাই।

বাজারের পিছনে একটা সরু গলিপথ। সামনের এই নারকীয় মারণ যজ্ঞ থেকে যেন দূরে—নির্জন। অন্ধকার। অরক্ষিত। জোভেঁ খুঁজে বার করেছেন সেই পথ। মাত্র বারজন সৈনিক আর সাতটা

জয়ঢাক নিয়ে চুপি চুপি জোভেঁ এসে ঢুকলেন সেই গলিপথ দিয়ে। লালটুপির বন্দুকধারী বারজন সৈনিকই আর আছে—তাদের নিয়েই জোভেঁর এই মরণ পাশার চাল।

ওদিকে বাদবাকীদের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি সহকারী গেশাম্পকে।

মাত্র উনিশটা লোক নিয়ে অসমসাহসী জোভেঁ এসে ঢুকলেন বাজারে। লাঁতেনার বাহিনীর পিছন দিক এটা। ঢুকেই সাতটা জয়ঢাক একসঙ্গে বিকটভাবে বেজে উঠল। তার সঙ্গে উনিশটা লোক লাগিয়ে দিল উৎকট চিৎকার। আর বারটা বন্দুকের অবিশ্রান্ত গুলির ধারা।

ভেণ্ডিরা ভাবল তারা সাঁড়াশি আক্রমণে পড়েছে। নীলের দল তাদের সামনে পিছন—ছ'দিক দিয়ে পিষে মারবে। সরলমনা কৃষকের দল—জোভেঁর চালাকি বোঝা তাদের কম্ম নয়—পালাল—যে দিকে পারল পালাল।

শুধু বুদ্ধি দিয়ে দেড়হাজারি মনসবদার জোভেঁ ছয়হাজারি লাঁতেনাকে পর্যুদস্ত করে দিলেন। ডল অধিকার করার আশা লাঁতেনার কাছে ছলনা মাত্রই হয়ে রইল। ইংরেজ সৈন্য অবতরণের শেষ ভরসাস্থল হাতছাড়া হয়ে গেল লাঁতেনার।

জোভেঁর সহকারী পলায়নপর সাদার দলকে তাড়া করেছে বহুদূর পর্যন্ত। প্রচুর ভেণ্ডি-সৈন্য বন্দী হল নীলের হাতে।

কিন্তু সবাই ভীতু নয়, সবাই পালায় না।

অগুণতি পলায়নী সৈনিকের মাঝেও একজন অসমসাহসী সৈনিক অটল হয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের পালানোয় সাহায্য করছিল। নিজের পালানোর কথা তার একবারের জন্যও মনে হয়নি। জোভেঁ তাকে লক্ষ্য করছিলেন। সৈনিকটির সাহস, শৌর্য, পরার্থপরতা দেখে তিনি মুগ্ধ।

লোকটি আহত, অবসন্ন। টলতে টলতে সে হঠাৎই একটা পাথুরে থামের উপর গিয়ে পড়ল। কোনোরকমে তার উপর ভর দিয়ে সে

পা দু'টো খাড়া রেখেছে। এতো আহত ও অবসন্ন, কিন্তু তার পিস্তল বা তরবারি কোনো কিছুই সে ছাড়েনি।

জোভেঁ সম্পর্কে ম্যারা বলেছিলেন—যুদ্ধে সে কঠোর, যুদ্ধের পর সে কোমল।

শত্রুকেও জোভেঁ কোমল চোখে দেখলেন, কেননা সে আহত, সে অপরের জন্য প্রাণ দিচ্ছে।

সুতরাং তিনি নিজের তরবারি কোষবদ্ধ করলেন। আহতের সঙ্গে কিসের যুদ্ধ!

তারপর একেবারে তার সামনে।

—আত্মসমর্পণ কর।—জোভেঁর নির্দেশ।

লোকটি কিন্তু কোনো জবাবই দিল না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জোভেঁর দিকে। তার সহস্র ক্ষত থেকে রক্ত বেরিয়ে মাটিতে একটা গর্ত ভর্তি করে ফেলেছে। তবু সে অবিচল।

—তুমি আমার বন্দী।—আবার জোভেঁর গলা।

লোকটি তখনও নীরব।

—তোমার নাম কি?

—লোকে বলে—'ছায়া-নর্তক'।

—সত্যিই তুমি সাহসী।—প্রশংসা জোভেঁর স্বরে।

—রাজা দীর্ঘজীবী হোন—হঠাৎই গায়ের শেষ সমস্ত শক্তিটা একত্রিত করে লোকটি চিৎকার করে উঠে লাফিয়ে উঠল দু'হাত তুলে। একহাতের পিস্তল গর্জে উঠল জোভেঁর বুক লক্ষ্য করে, আরেক হাতের তরবারি নেমে এল জোভেঁর মাথার উপর।

অবিশ্বাস্য। অকল্পনীয় তার ক্ষিপ্রতা। বর্ণনা করতে যতটুকু সময় লেগেছে তার থেকেও অনেক কম সময়ে লোকটি আক্রমণ করেছে জোভেঁকে। এতো দ্রুত তার আক্রমণ যে আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই নেই জোভেঁর।

তবু জোভেঁ বেঁচে গেলেন। এতটুকু আঘাতও লাগেনি!

সেটাও অবিশ্বাস্য ; অকল্পনীয় তো বটেই। কিন্তু লৌকিক এবং সত্যি।

ঠিক—ঠিক এই সময়েই দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন একজন অশ্বারোহী। তাঁর গতি ঐ সৈনিকটির থেকেও দ্রুততর। সৈনিকটির গতি যদি হয় ঝড়, অশ্বারোহী তবে আলো।

তিনি উপস্থিত হয়েই দেখেছেন জোভেঁর কথার কোনো উত্তরই দিচ্ছে না লোকটি। চোখ তার জোভেঁর চোখে। হাত দু'টি কিন্তু তার ধীরে ধীরে অস্ত্র দু'টি সংগ্রহ করছে। অস্ত্র দু'টি প্রস্তুত। অস্ত্র দু'টি উদ্যত। আগন্তুক স-ঘোড়া লাফ দিলেন দু'জনের মাঝে। গুলি ছুটল—লক্ষ্য ছিল জোভেঁর বুক, লাগল গিয়ে আগন্তুকের ঘোড়ার বুকে, তরবারি নামল—লক্ষ্য ছিল জোভেঁর মাথা—লাগল আগন্তুকের মুখে।

ঘোড়া আর আরোহী একসঙ্গে ভূলন্ঠিত। আততায়ী সৈনিক অবশিষ্ট শক্তি অপচয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মাটিতে পড়ে গেল। হতচকিত জোভেঁ মুহূর্তের মধ্যে সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কে এই রক্ষাকারী ? কে এই আগন্তুক ?

আমরা পন্টরসনের সরাইখানার সামনে দেখেছি এই অশ্বারোহী আগন্তুককে। জোভেঁ তাও দেখেননি। কিন্তু আমরাও জানিনা কে এই আগন্তুক—জোভেঁ তো জানেনই না।

সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন জোভেঁ—কেউ চেনে কিনা আহত আগন্তুককে—যিনি জোভেঁর প্রাণ বাঁচিয়েছেন! না কেউ জানে না—চেনে না।

চিকিৎসক এলেন। ঘোড়াটি মারা গেছে। কিন্তু মানুষটির ক্ষত গভীর বটে তবে জীবনহানিকর নয়। সাত-আটদিনে সুস্থ হয়ে যাবেন জোভেঁর জীবনদাতা।

এবার নিশ্চিন্ত হলেন জোভেঁ। কেউ যখন চিনতে পারছে না

তখন জোভেঁ নিজেই আগন্তুকের জামার পকেট হাতড়ালেন। বেরিয়ে এল একটা কাগজ। লেখা আছে—'জন নিরাপত্তা সমিতি—সিমোর্দে।'

—সিমোর্দে! সিমোর্দে!! কি আশ্চর্য! সিমোর্দে তো আমার শিক্ষক—আমার পিতৃতুল্য—! বিস্মিত জোভেঁর চিৎকারেই যেন জ্ঞান ফিরে এল আহত ব্যক্তির। হতচেতন অবস্থা থেকেই তিনি বলে উঠলেন—

—তুল্য নয়, পিতৃতুল্য নয়। বল পিতা—! তোমার পিতা।

দশ

টেলেমার্ক চুপ করতে বলেছিল মিচেলকে। বলেছিল যদি না মিচেল চুপ করে তবে মিচেলের আবার জ্বর হবে, আবার অসুখ বাড়বে। সেইকথা শুনেই হোক, অন্য কারণেই হোক চুপ করেছিল মিচেল।

কিন্তু মিচেল সেই যে চুপ করল তো করলই। চুপ করে থাকে। মিনিট যায়, ঘণ্টা যায়, যায় দিনের পর দিন। মিচেল আর কোনো কথাই বলে না।

টেলেমার্কের ঘরের সামনে ছিল টেলেমার্কের মতোই অতিবৃদ্ধ জরাজীর্ণ একটি গাছ—তারই তলায় দিনমানে বসে থাকে মিচেল, মুখে কোনো শব্দ নেই—চোখ দু'টিও যেন ভাষাহীন। কিসের একটা ভাবের ঘোরে মিচেল থেকে যায় নীরব। কিসের স্বপ্ন দেখে মিচেল!

টেলেমার্কও চুপ করে থাকে। কোনো কথাই সে মিচেলকে বলে না। বোঝে মিচেল কোনো একটা ভাবনা জগতে হারিয়ে যায়, কোনো এক স্বপ্নের জগতে সে ভেসে ভেসে চলে। মিচেলের এই কথাহীন তন্ময় চেহারা দেখে টেলেমার্ক। নিরীহ টেলেমার্কের সাহসই হয় না তাকে কথা বলানোর!

টেলেমার্ক বোঝে, মা—তিন সন্তানের মা—যে জগতে ভাবনার ডানা

মেলে দিয়ে উড়ে বেড়ায়, সেখানে আর যারই থাক, তার কোনো জোরই নেই প্রবেশ করবার। এ এমন এক কল্পলোক যা কেবল মায়েদের জন্যই তৈরী ; সেখানে আর কারোর ঢোকার অধিকার নেই। মাতৃত্ব এমনই একটা বোধ—যা অন্যের কাছে দুর্বোধ্য। মাতৃস্নেহ নিয়ে তর্ক চলে না, যুক্তি চলে না, একদিক দিয়ে মাতৃত্ব এক ধরনের পশুশক্তি। পশু তার শাবককে বুক দিয়ে আগলে রাখে, তখন সে হিংস্র। মানুষ মার উপরেও তার সন্তানদের মঙ্গল চিন্তায় এই ধরনের আরণ্যশক্তি ভর করে। নারী আর মা তো এক নয়—টেলেমার্ক বোঝে। মায়ের মাতৃত্ববোধই একজন নারীকে মহিমময়ী করে তোলে। 'মা'—এই কথাটার মধ্যেই যেন থাকে একটা আলাদা রকম জোর। মায়ের কাছে তাই তার মাতৃত্ব বিষয়ে কোনো তর্ক চলে না, যুক্তি চলে না। সন্তানস্নেহে মায়ের যে অদম্য প্রেরণা সেটা বুঝি সাধারণের আওতাতেই পড়ে না। সাধারণ চিন্তায় মায়ের ভাবনা-ভালোবাসা-স্নেহ ধরা যায় না। মায়ের মনের এই চেহারাটা অন্য কিছুর সঙ্গে মেলানো যায় না, তর্ক করে এর নাগাল পাওয়া যায় না। মায়ের মধ্যে থাকে এমনই একটা সত্যদৃষ্টি—যা কিনা সৃষ্টির প্রেরণা দেয় মাকে, তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় তার মাতৃত্ববোধ। সন্তানের প্রতি স্নেহে মা অন্ধ—তবুও তার মধ্যে থাকে একটা এমনই শক্তি-বলয় যার তুলনা চলে একমাত্র কোনো স্বর্গীয় আভার।

টেলেমার্ক তার সহজ সরল বুদ্ধিতে বসে বসে এই ভাবে। ভাবে আর মিচেলকে লক্ষ্য করে। নিজের অসহায় বার্ধক্য তাকে যেন ব্যঙ্গ করে —বেচারি টেলেমার্ক! কোনো যুক্তি দিয়েই সে তার অপরাধকে হাল্কা করে দেখতে পারে না ; মিচেলের এই কষ্টের জন্য সমস্ত দায় বোধটাই সে তার নিজের কাঁধে তুলে নিতে চায়। নিতে চায় আর অপরাধের ভারে ক্রমশই কুঁকড়ে যায়। যদিও মিচেলের কোনো নজরই নেই টেলেমার্কের এই দিন দিন একটু একটু করে বেড়ে ওঠা অপরাধী ভাবের দিকে।

একটা কুঁড়েঘর। ছ'জন বাসিন্দা। ছ'জন ছুই ভাবনায় বিভোর।

তবু তারই মধ্যে টেলেমার্ক হাজার হলেও পোড়খাওয়া মানুষ। জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সে বাস্তব জগতকে অনেক অনেক বেশী চেনে। কিন্তু তার এই অভিজ্ঞতায় তো মিচেলের এই অন্তর্মুখী মনকে বহির্মুখী করা যাবে না! তবু—তবু একদিন নিজের অসহায় অবস্থাটাকে বোঝাবার জন্যই যেন সে মিচেলকে বলে—

—কি করব বল? বড্ড বুড়ো হয়ে পড়েছি। গায়ে নেই আর এককণা শক্তি। ছ'পা হাঁটলে সারা শরীরটা থরথর করে কাঁপে। জিরোতে হয়। হাঁফ ধরে যায়। বেশীদূর তো যেতে পারি না। না হলে তোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম রে।

কথাগুলো পাথরে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসে। মিচেল আর মানবী নেই। রক্তমাংস দিয়ে গড়া পাথরমূর্তি। কেবল তার নীরব চোখ ছ'টো একবার টেলেমার্কের মুখের উপর ঘুরে যায়। যেমন চুপ ছিল মিচেল তারপরও তেমনিই থাকে।

টেলেমার্ক। হতভাগ্য টেলেমার্ক! নিজের মধ্যে নিজে আরো গুটিয়ে গেল। মনে হল তার অপরাধ বুঝি কোনোদিনই মিচেল ক্ষমা করবে না।

টেলেমার্ক তার নিজের বিবেক দিয়ে ভেবে চলেছে। আসলে সেই বা কি করে বুঝবে মিচেল কি ভাবছে?

টেলেমার্ক হার্ব-এন-পেইলের গোলাবাড়ির ধ্বংসকাণ্ডের পর থেকেই মার্কুইসকে বাঁচানোটা তার অপরাধ হয়ে গেছে এই ভেবে ভেবেই নিজের উপর নিজে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। এমন কি তার দ্বিতীয় মনটা যখন—বিপন্ন মানুষকে বাঁচানো পাপ নয়, ভালো কাজ—এই বলে সান্ত্বনা দিতে চায়, তখনো টেলেমার্ক মনে মনে ঠাণ্ডা হতে পারে না।

মিচেল তার সামনে এক জ্বলন্ত উদাহরণ—টেলেমার্ক ভাবে—যে অপরাধ টেলেমার্ক করে ফেলেছে তারই সাক্ষী যেন এই মিচেল।

টেলেমার্ক যে সত্যি কোনো অন্যায় করেনি—একথাটাই বা তাকে কে বোঝাবে ?

সন্তানদের চিন্তায় এমন আত্মমগ্না মিচেল, তাকেই বা কে বোঝাবে কোন ঘটনাপ্রবাহে তার এই সর্বনাশ।

এরা দু'জনেই সাধারণ—অতি সাধারণ মানুষ। সহজ সরল দু'টি প্রাণী। দেশের এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ কি ? কেন ? লাভ লোকসান কার ? কোনো কিছুই তাদের মাথার মধ্যে ঢোকে না। ভাবেও না তারা। ভাববার মতো বোধশক্তিই তাদের নেই—এতোই নগণ্য প্রাণী তারা।

তবু টেলেমার্ক ওরই মধ্যে ভেবে ভেবে ঠিক করল—মিচেলকে এইভাবে চুপচাপ থাকতে দেওয়া যায় না। এ রকম কর্মহীন নীরবতা ওকে পাগল করে দেবে। টেলেমার্ক ঠিক করল ওকে কাজের মধ্যে রাখতে হবে, কাজে ডুবিয়ে দিতে হবে ; তাহলেই ওর এই অলস ভাবনা থেকে একসময়ে ও মুক্তি পাবে।

বুদ্ধি করে টেলেমার্ক তাই মিচেলকে এনে দিল ছুঁচ-সুতো। কয়েকদিন সেগুলো দেখেও দেখল না মিচেল। তারপর একদিন টেলেমার্ক খুশি হয়ে উঠল। মিচেল সেলাই করছে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সেলাই করে বটে। কিন্তু আগেও তার যে উদাস স্বপ্নালু ভাব ছিল এখনো সেটাই রয়ে গেছে। কোনো কথা এখনো নেই তার মুখে। তবু মন্দের ভালো—ভাবল টেলেমার্ক। কথা না বলুক কাজ তো করছে। কাজ করা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। মিচেল সেলাই করেই চলে।

এক এক করে সে সেলাই করল তার কাপড়, জামা, জুতো—সব। চোখ কিন্তু এখনো ভাবহীন। সে যে একটা জীবিতা নারী ভাববার কোনো কারণ তার হাবেভাবে নেই। মাথা নীচু করে সে সেলাই করে। খুব কান খাড়া করলে শোনা যাবে অতি মৃদু একটা গানের সুরের মতো কিছু তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে ; নিজের মনেই সে যেন কাউকে

ঘুম পাড়ায়, গানের তুলুনিতে আদর করে। কিন্তু এতো ক্ষীণ সে স্বর যে টেলেমার্ক তা বুঝতে পারে না। কখনো কোনো শিশুর নামের অর্ধস্ফুট উচ্চারণ। টেলেমার্ক সেটাও বোঝে না।

কখনো কখনো হঠাৎই মিচেল মাথা তুলে গাছের মাথায় বসা পাখির গান শোনে কান খাড়া করে, যেন উৎকর্ণ হয়ে শোনে সেই গানের মধ্যে তার সন্তানদের কোনো খবর !

হঠাৎই একদিন টেলেমার্ক দেখল মিচেল সেলাই শেষ করেছে একটা থলের। তারপর দেখল সেটা বাদামে ভর্তিও করেছে মিচেল।

পরদিন সকাল।

টেলেমার্ক বিস্ফারিত নয়নে বুঝবার চেষ্টা করল—মিচেল কি করতে চলেছে ! আর্তকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করে—

—তুই—তুই চলে যাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কোথায় ?—কান্নায় বুজে আসে টেলেমার্কের গলা।

—ওদের খুঁজতে। চোখ দু'টো মিচেলের সুদূর বনের দিকে।

টেলেমার্ক কান্না চেপে রাখল। না—কোনো বাধা টেলেমার্ক দেয় নি, কোনো প্রশ্নও আর করে নি।

টেলেমার্ক আর মিচেল। পরস্পরের জীবনে যেমন হঠাৎই এসেছিল—হঠাৎই আলাদা হয়ে গেল।

## এগার

ডলে হেরে গেলেন লাঁতেনা।

ছ'হাজার সৈন্য আর ষোলটা কামান থাকা সত্ত্বেও তিনি হেরে গেলেন জোভেঁর কাছে।

এরপর হারলেন ইল্—এট্—দেলঁ্যায়।

তারপরেও হার। একের পর এক হার।

না। লাঁতেনা জিততে পারছেন না।

লাঁতেনাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রেখেছে রাজতন্ত্রসেবীরা—লাঁতেনা মানেই রাজতন্ত্রের পুনরুত্থান। কিন্তু সে সম্ভাবনা ক্রমশই দূরে চলে যাচ্ছে।

জোভেঁ জিতে চলেছেন। একের পর এক তাঁর নীলের দলের জয়পতাকা প্রোথিত হচ্ছে সমগ্র উপকূল ধরে। সাধারণতন্ত্র সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

সাধারণ মানুষ কিন্তু একটু একটু করে ভাবনায় পড়ছে।

সাধারণতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে—কিন্তু এ কোন সাধারণতন্ত্র!

লাঁতেনা ফুজিয়ার্সে। জোভেঁ এবং তার বাহিনীও ফুজিয়ার্স অঞ্চলে। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতন্ত্রের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা উড্ডীন।

কিন্তু একই সাধারণতন্ত্রের এরকম দু'টি ধারা কেন? সাধারণতন্ত্রের সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা।

দু'জন মানুষ। দু'টি ব্যক্তিত্ব। দু'ধরনের চিন্তা পদ্ধতি। দু'ধরনের কর্মধারা। আচরণ দ্বিবিধ।

কে এই দু'জন মানুষ?

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাধারণতন্ত্রের মূল চালক এঁরা দু'জনেই—

দু'জনে কাজও করছেন একটাই—শত্রু নাশ করে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কার্যপদ্ধতিতে তাঁদের এতোই তফাৎ যে তাঁরাই হয়ে উঠেছেন সাধারণ লোকের কাছে মূল আলোচ্য বিষয়। হাটে-মাঠে-ঘাটে এঁদের দু'জনকে নিয়েই চলছে সদা সর্বদা তর্ক।

একজন বিভীষিকার ভয়াল প্রতিমূর্তি, অন্যজন সদয়। প্রশাসনে একজনের মূলমন্ত্র কঠোরতা, অন্যের মন্ত্র—ভালোবাসা-সম্প্রীতি-করুণা। দু'জনেই অমিত ক্ষমতার অধিকারী।

একজন সামরিক প্রধান—তাঁর শৌর্যেই সাধারণতন্ত্রের জয়জয়কার।

আরেকজনের প্রতিনিধিত্ব অসামরিক—কিন্তু তাঁর ক্ষমতার উৎস সবচেয়ে উপরমহলে ; জন নিরাপত্তা সমিতির তিন নায়ক রোবসপিয়র-দাঁতোঁ-ম্যারার প্রতিভূ তিনি।

সমরনায়ক জানেন ক্ষমা আর দয়া করার অধিকার তাঁর আছে। যতক্ষণ শত্রু অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করছে ততক্ষণ তিনিও দুর্জয়, নির্মম। কিন্তু যে পরাজিত-নিরস্ত্র তাকে ক্ষমা করাই তো মানুষের ধর্ম। বিজেতা যদি বিজিতকে ক্ষমা করতেই না শেখে তবে তার বীরত্বের অহঙ্কার কিসের ?

অন্যজন, অসামরিক প্রতিনিধি, তা মনে করেন না। শত্রু শত্রুই। তাকে নির্মূল করে দাও, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। নির্মম হতে হবে। নৃশংস হতে হবে। শত্রুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত বুঝিয়ে দিতে হবে শত্রুতা করা কতবড় অপরাধ !

ফলে দু'জনের মতান্তর বেড়ে চলে। বিরোধ ভিতরে ভিতরে ; যদিও বাইরে দু'জনে দু'জনের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসায় আপ্লুত।

পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সরাসরি বিরোধিতা করেন না ; কিন্তু কাজের ধারায় তো সেটা প্রকাশিত ! আর সাধারণ মানুষ সেটা না বুঝবে এমন নির্বোধ তারা নয় ! ফলে দু'জন মানুষকে নিয়েই চলে তাদের আলোচনা।

মজার কথাটা আবার—নির্মম মানুষটিই দয়ালুর জীবনদাতা। নিজের জীবন বিপন্ন করে তিনি সমরনায়কের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আর সেই মহৎ কর্মের সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর মুখ। তরবারির ঘা দগদগ করে এখনো।

এতো বিরোধ—কিন্তু কোন এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা বোধ বন্ধনে দু'জনে দু'জনের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন ! একের প্রতি অপরের সহানুভূতি-ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-স্নেহ যে কত গভীর তাও সাধারণ মানুষের অজানা নয়।

ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে দু'জনের সম্পর্ক যেন পিতা-পুত্রের—কিন্তু

কর্মক্ষেত্রে দু'জনে দুই মেরুতে বাস করেন। এ এক অদ্ভুত অবস্থা। নীতিগত পার্থক্যই শেষ পর্যন্ত দু'জনকে একদিন অঘোষিত যুদ্ধে নামিয়ে আনল। প্রশ্নোত্তর থেকে দেখা দিল সরাসরি দ্বন্দ্ব।

মানুষ দু'টি কে—তা কি বলে দিতে হবে ?

একজন জোভেঁ—সমরনায়ক।

অপরজন সিমোর্দে—অসামরিক প্রতিনিধি।

তা একদিন সিমোর্দে জোভেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—কাজ কতদূর এগোল ?—যেন সিমোর্দে জানেন না কিছুই।

কিন্তু জোভেঁও কম নয়। বিনীত ভাবেই উত্তর দিলেন—

—যতটুকু আপনি জানেন, আমি জানি ঠিক ততটুকুই। লাঁতেনার বাহিনী ছত্রভঙ্গ। আত্মগোপন করেছেন তিনি ফুজিয়ার্সের অরণ্যে—সঙ্গে কয়েকটি মাত্র অনুচর।

—তারপর ?

—আটদিন। আর আটদিনের মধ্যেই তাঁকে আমরা ঘিরে ফেলব।

—তারপর ?

—তাঁকে বন্দী করা হবে।

—তারপর ?

—আমি যে ঘোষণা করেছি, সেটা তো পড়েছেন আপনি। পড়েন নি ?

—পড়েছি।

—সেই ঘোষণা অনুসারে তাঁকে গুলি করা হবে।

—গুলি করা তো দয়ারই নামান্তর। গিলোটিন নয় কেন ?

—তিনি সমরনায়ক। সমরনায়কদের মৃত্যু হওয়া উচিত সামরিক নিয়মে।

—না—সে বিদ্রোহী। তার মৃত্যু হবে বিদ্রোহীদের মতোই।

জোভেঁ কোনো উত্তর দিলেন না। স্থির অকম্প দৃষ্টিতে তাকালেন

সিমোর্দের দিকে। চোখে চোখ। সিমোর্দেও সেই চোখের উপর চোখ রেখেই কঠিন ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলেন—

—সেণ্ট মেরী লি ব্লাঙ্কের সন্ন্যাসিনীদের মুক্ত করে দিয়েছিলে তুমি?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—জোভেঁ নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করে না।

—এরা নারী? এরা জনসাধারণকে ঘেন্না করে—এটা তুমি জান না?

মনে হল জোভেঁ এর জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন না। এমনই তাঁর চুপ করে থাকার ভঙ্গি। তাঁর নীতি থেকে তিনি সরতে রাজী নন।

সিমোর্দে আরো ক্রুদ্ধ।

—লুভিয়েদেঁ যে বৃদ্ধ যাজকরা ধরা পড়েছিল বিচারের জন্য তাদের জন নিরাপত্তা সমিতিতে পাঠাতে তুমি আপত্তি করেছ?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—বৃদ্ধদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে জোভেঁ?

—লাঁতেনা কি? যুবক?

—না বৃদ্ধ। কিন্তু সেটাই তাঁর পরিচয় নয়। তিনি বিদেশীর চর। তিনি ইংরেজদের ডেকে আনছিলেন। লাঁতেনা দেশের শত্রু। তাঁর সঙ্গে আমার যুদ্ধ শেষ হবে সেই দিন—যে দিন হয় লাঁতেনা মরবেন নয় মরবে জোভেঁ।

—এটা তোমার প্রতিজ্ঞা?

—এ আমার অঙ্গীকার। এ প্রতিজ্ঞায় আমি দৃঢ়।

—মনে রেখ।

—নিশ্চয়ই।

এরপর দু'জনেই নীরব। দৃষ্টি কিন্তু দু'জনের উপরই দু'জন নিবদ্ধ রেখেছেন।

জোভেঁর গলায় যেন বিষণ্ণতার সুর। কথা বললেন তিনি।

—এই সতেরশ' তিরানব্বই সাল—বিভীষিকার রাজত্বকাল।

—এই বিভীষিকা থেকেই জন্ম নেবে সাফল্য—ফরাসী বিপ্লবের সার্থক পূর্ণতা আসবে এর থেকেই।

—না। এই বিভীষিকা হয়ে থাকবে ফরাসী বিপ্লবের কলঙ্ক। আমাদের স্বপ্ন কি? স্বপ্ন—শান্তি প্রতিষ্ঠা! আমাদের মূলমন্ত্র—কি? সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা। আমাদের সেই স্বপ্ন—আমাদের সেই মূল মন্ত্র তার সার্থকতা কি এই বিভীষিকা? সিংহাসন আমরা উল্টে দিয়েছি। কেন? অত্যাচারের আর শোষণের কেন্দ্র—ঐ সিংহাসন। কিন্তু সিংহাসন সরিয়ে সেখানে ঝুলিয়ে দিয়েছি ফাঁসিকাঠ। ফাঁসিকাঠ কি শান্তির পায়রা? রাজতন্ত্র সরিয়ে এ কোন বিভীষিকা তন্ত্রের আমরা পোষণ করে চলেছি? রাজমুকুট মাথা থেকে টেনে ফেলে দিন—কিন্তু তাই বলে মাথাটাকেও কাটব? বিপ্লব তো মৈত্রীর জন্য—বিপ্লবের উদ্দেশ্য কি আতঙ্ক? যারা নিজেরা নিষ্ঠুর, তারা জগতের কল্যাণ করবে কি করে? বলতে পারেন—পৃথিবীর কোনো দেশে—কোনো ভাষায়—মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে—'ক্ষমা' এই শব্দটার থেকে সুন্দরতম আর কোনো শব্দ তৈরী হয়েছে? আমি যদি ক্ষমা করতেই না শিখলাম—তবে আমি কিসের মানুষ—? কিসের বীর? কি প্রয়োজন আমার জয়ের—বলতে পারেন? যতক্ষণ যুদ্ধ চলবে আমি শত্রুর শত্রু—যুদ্ধ শেষে আমি তার ভাই।

অজানা কোনো কারণে সিমোর্দে ভিতরে ভিতরে শিউরে উঠলেন। তবু গলাটাকে স্বাভাবিক করেই বললেন—

—জোভেঁ। এখনো সময় আছে। সাবধান হও। আমার কথা শোন—সাবধানে চল—এখনো সময় আছে।—জোভেঁ—জোভেঁ তুমি আমার ছেলের থেকেও বেশী!

সিমোর্দের মনের মধ্যে তখন একটা কু-ডাক—দিনকাল যা পড়েছে ‘দয়া’ যে কখন ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ হয়ে যায় তার ঠিক কি ?

বার

গায়ের জামা ছেঁড়া। পায়ে কোনো একসময়ে জুতো ছিল এখন নেই। পা দু'টো তাই ক্ষতবিক্ষত। চুলে জট। এক উন্মাদিনী। মুখে তার একটাই কথা—

—তোমরা কেউ দেখেছ ? দেখেছ তিনটি বাচ্ছাকে ?

কিন্তু কাকে করছে এই প্রশ্ন ?

গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে পথ ঘাট তো জনশূন্য। তবু এই প্রশ্ন করছে কখনো কোথাও পথচলতি কোনো কৃষকের যদি দেখা পেয়ে যায় মিচেল—তাকেই করছে।

হ্যাঁ। উন্মাদিনী প্রায় এই নারীই মিচেল।

টেলেমার্কের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল সে। সঙ্গী অসীম আকাশ আর অনন্ত পৃথিবী। এরাই তার ভরসা, এরাই তার বন্ধু।

পথে পথে অনেকদিন চলে গেছে। হাঁটে সে পথ, কিন্তু সেটা পথ কিনা তাও সে জানে না। চলে, কি ভাবে চলে, কোথা দিয়ে চলে সে ধারণাই তার নেই। কি ভাবে সে বেঁচে আছে—কেউ যদি তাকে জিজ্ঞাসা করে তবে তার কোনো জবাব জানা নেই মিচেলের। কখন সূর্য ওঠে, কখন ডোবে, কোনোদিন চাঁদ ওঠে, কোনোদিন তাও ওঠে না—কোনোদিন বৃষ্টি, কোনোদিন রৌদ্রের প্রখর তাপ, কখনো সোজা রাস্তা, কখনো শুধু বন—সে হেঁটে চলে—হেঁটেই চলে। কোনো বোধ নেই, কোনো অনুভূতি নেই।

শুয়ে থাকে মাটিতে, ঘুমোয় ঝোপঝাড়ে। প্রায়শই অনাহার। অর্ধাহার হয়, যদি বনজ ফল জোটে।

এই ভাবেই চলেছে মিচেল। চলেছে—পথে কোনোদিন কোথাও যদি কাউকে দেখতে পেল—ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে—

—হ্যাগো। তুমি দেখেছ—তিনটে বাচ্ছাকে! তিনটে বাচ্ছা—ছোটটার এই কুড়িমাস—বড়টা সাড়ে চার বছর—দেখেছ কিনা বল না? জান তারা কোথায় আছে? জান তো বল না। দু'টো ছেলে একটা মেয়ে। রেণিজঁা—গ্রয়েলেন—জর্জেট। হ্যাঁ। আমারই ছেলেমেয়ে। বলনা গো—যদি জান।

পথচলতি মানুষ—যাদের দেখা পায় মিচেল, তারা অতি সাধারণ কৃষক—তাদেরই বলে কথাগুলো।

কিন্তু লোক চলে পথ ধরে। তা মিচেলের সামনে পথ কোথায়! সে হাঁটে কখনো বনের মধ্যে, কখনো পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে। কখনো কোনো গ্রাম, কখনো দু'একটা ঘর বাড়ি—যখন যা পায় সামনে সেখানেই দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে। সামনে মানুষ পেলে তো করেই—শূন্য ঘরের খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়েও করে।

দিনের পর দিন চলে যায়, আর সে অতিক্রম করে জঙ্গল, গ্রাম, শহর, আবার জঙ্গল, আবার গ্রাম, আবার শহর।

চারপাশে গৃহযুদ্ধের রক্তাক্ত কুরুক্ষেত্র। গোলাগুলি এসে পড়ে কখনো কখনো—ভ্রূক্ষেপও নেই তার। কখনো পরিত্যক্ত গ্রাম—ভেবেও দেখে না কেন এই অবস্থা।

সারাটা অঞ্চলে বিপ্লব—যুদ্ধ—রক্ত—আগুন—মৃতদেহ। প্রশাসন নেই, কর্তৃপক্ষ নেই, প্রহরী নেই। তাই পথ যদি বা পায়, জনপদ যদি সামনে পড়ে, লোক পায় না বড় একটা। নেহাত খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউই বেরোয় না প্রকাশ্যে। চারপাশেই ভয়ের চিহ্ন।

সেই নেহাত প্রয়োজনে পড়া মানুষ কাউকে যদি পেয়ে যায় মিচেল তাকেই কথাগুলো বলে।

কিন্তু যাদের বলে—তারা তাকে ভাবে পাগলি। কেউ এড়িয়ে

যায়, কেউ দ্রুত পালিয়ে যায়, কেউ একটু ধৈর্য ধরে শোনে, কেউ বা তাও শোনে না।

কিন্তু জবাব কারোর কাছেই পায় না সে। পাবে কি করে? কেউ কিছু জানলে তবে তো বলবে। কেউ কিছু বুঝলে তবে তো উত্তর দেবে!

জননী কোনো প্রশ্নের জবাব পায় না আর হতাশায় ভেঙে পড়ে। বুকের ভিতর যেন ঈগলে ঠুকরে খায়। মিচেল পাগল হল—না পাগলই ছিল? ভুলে যায় সে। মিচেল কে—তাও মিচেল ভুলে যায়। মিচেলের আর কেউ ছিল কি? মিচেল ভুলে গেছে। সমস্ত সত্তায় তার কেবল তিনটি শিশুর অস্তিত্ব—স্বপ্নের ঘোরের মতোই সে অস্তিত্ব। তাদের বয়স বেড়েছে কিনা—তাদের চেহারা কি রকম হয়েছে—সব যে তালগোল পাকিয়ে গেছে তার কাছে। মাতৃত্ব আর সন্তানের অস্তিত্ব সব মিলে মিশে একটা আচ্ছন্নতা!

এমনি ভাবেই পথ চলে সে। এমনি ভাবেই জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্নে আর্তি। কিন্তু উত্তরের কোনো প্রত্যাশা কি আছে মিচেলের!

অবশেষে—

অবশেষে একদিন এক পথ চলতি কৃষককে পেল—যেমন এর আগেও পেয়েছে অনেককে। যেমন আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে একেও তাই করল—

—জান—তিনটে বাচ্ছা—

এই কৃষকও এড়িয়েই চলে যাচ্ছিল। চলে গিয়েছিল।

তারপরই!

তারপরই কি মনে করে এসে আবার শুনল মন দিয়ে মিচেলের কথাগুলো। মনে করার চেষ্টা করল যেন কিছু।

—কি যেন বললে? তিনটে বাচ্ছা!

—হ্যাঁ। হ্যাগো তিনটে বাচ্ছা। আমারই ছেলেমেয়ে। জান যদি বল না।

—তার মধ্যে দু'টো কি ছেলে ?

—হ্যাঁ। আরেকটা মেয়ে।—মায়ের গলায় ব্যগ্রতা।

—তুমি—তুমি তাদের খুঁজছ ?

—খুঁজব না ? বললাম যে আমি তাদের মা।

—একজন রাজা—

অতি সাধারণ কৃষক এই মানুষটি। বড়লোক—জমিদার—ক্ষমতা-শালী মানেই রাজা—এর বেশী তার বোধশক্তি কাজ করে না। জ্ঞানের পরিধি তার ওই পর্যন্তই। সাধারণতন্ত্র কি—রাজতন্ত্রই বা কি ?—নীল কে—কেইবা সাদা কিছু বোঝে না। বোঝে যুদ্ধ চলছে—রাজারাই তো যুদ্ধ করে—আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। তাই যুদ্ধের সেনাপতিও তার কাছে রাজাই।

—রাজা ?—মায়ের আর তর সয় না।

—একজন রাজা—মানে ঐ খুব বড়লোক রাজা—তিনি শুনেছি তিনটে বাচ্ছাকে নিয়ে গেছেন। দু'টো ছেলে একটা মেয়ে। ওরা তাঁর সঙ্গেই আছে।

—কোথায় ? কোথায় সে ?—মা বুঝি ঝাঁপিয়েই পড়ে কৃষকের উপর।—'কোথায় আমার বাছারা ?'

—তারা—লা টুর্গে।

—সেখানে গেলে আমি পাব তাদের—দেখতে পাব ?—

—বোধহয়।

—কি জায়গাটা বললে ?

—লা টুর্গ।

—সেটা কি ?

—সেটা—সেটা একটা জায়গা।—আসলে কৃষকেরও কোনো ধারণা নেই লা-টুর্গ সম্পর্কে।

—অনেক দূর ?

—কাছে তো নয়ই।

—কোন দিকে ?

—ঐ—ঐ দিকে।—লোকটি পশ্চিমের দিকে আঙুল তুলে দেখায়।—'ওই যেদিকে সূর্য অস্ত যায় সেই পশ্চিম বরাবর। কিন্তু সেখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছে তো।—'

কথা শেষ করার আগেই কৃষক দেখল ছুটে চলে গেছে নারীটি।

হারানো সন্তানদের হদিস পেয়েছে এক মা। স্বর্গ থেকে অবতরণের সময়ে গঙ্গার প্রবল বেগকে ধারণ করার ক্ষমতা নাকি ছিল এক শিবেরই—হিন্দু পুরাণ বলে। সেই শিবও চেষ্টা করলে বোধহয় সন্তানহারা এই জননীর গতি রোধ করতে পারতেন না। সূর্যাস্তের পশ্চিম দিগ্বলয়ে সে তখন হারিয়ে গেছে।

## তের

নেহাত যুদ্ধ চলছে—

তাই বেচারি কৃষকের কানে গেছে লা টুর্গের নামটা। নাহলে সেও জানত না 'লা-টুর্গ'—কি সেটা ? তাই মিচেলের প্রশ্নের জবাবে বলেছিল—'সেটা—একটা জায়গা'।

তা সত্যিই লা টুর্গ কি ?

ফুজিয়ার্স। দুর্ভেদ্য অরণ্য একটা। তারই প্রান্তসীমায় আবার পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাথায় রয়েছে অগম্য প্রায় দুর্গ এক—তারই নাম লা-টুর্গ।

আকাশ ছুঁয়ে রয়েছে তিনদিকে তিনটে পাহাড়। একেবারে খাড়া। সেই তিনদিক দিয়ে দুর্গে উঠতে পারে যারা—তাদের দু'টো করে ডানা আছে—। হ্যাঁ একমাত্র পাখিরাই পারে উঠতে সেখানে।

চতুর্থ একটা দিক আছে অবশ্য। সেদিকেই হচ্ছে ফুজিয়ার্সের মহারণ্য। কষ্টে সৃষ্টে যদি অরণ্য অতিক্রম করে দুর্গের কাছ বরাবর পৌঁছোন যায় তবে দুর্গের ঠিক সামনেই পাওয়া যাবে এক গভীর খাদ।

সেই অতল খাদের ওপারে তিনপাহাড়ের মাঝে একটি দুর্গ—তারই নাম লা-টুর্গ।

কোনো এক দূর অতীতে তৈরী হয়েছিল এই দুর্গ। দুর্গ হিসেবে দুর্ভেদ্য। কোনো শত্রুর পক্ষেই সম্ভব ছিল না লা-টুর্গে প্রবেশ করা। কিন্তু কেবল দুর্ভেদ্য হলেই তো হল না—যারা থাকবে তাদের আরাম-বিরামটাও তো দরকার। তা সেদিক দিয়ে লা-টুর্গ আবার একেবারেই নিরেস।

সময়টা তখন সপ্তদশ শতাব্দী। দুর্গস্বামী তখন যাঁরা ছিলেন তাঁরা আবার আরাম ও বিলাসপ্রিয়। এই দুর্গে থেকে তাঁদের মন ভরছিল না। তাই তাঁরা অনেক মাথা খাটিয়ে তৈরি করলেন একটা আরামদায়ক রমণীয় প্রাসাদ।

তা কোথায়?

না—ঐ খাদের উপর প্রথম বানানো হল পাথরের সেতু। তারই উপর তৈরী হয়েছিল প্রাসাদ।

মনের আনন্দে প্রাসাদ তো তৈরী হল। কিন্তু তারপর—তারপর বাবুদের খেয়াল হল—'আরে একি? দুর্গ ছিল আরামহীন—কিন্তু শত্রুদের কাছে দুর্ভেদ্য। আর প্রাসাদ হল বিলাসবহুল, কিন্তু যে কেউ বন পেরিয়ে এসে সহজেই ঢুকে পড়তে পারবে প্রাসাদে—প্রাসাদ থেকে দুর্গে!'

এখন উপায়?

মাথা খাটিয়ে উপায়টাও তাঁরাই বার করলেন।

সেতুপ্রাসাদ আর দুর্গের মাঝে খাড়া করা হল পনের ফুট মোটা পাথরের এক পাঁচিল। আর সেই পাঁচিলের মধ্যে বসানো হল এক বিরাট লোহার দরজা। এমনি এক দরজা সে—যে বন্ধ থাকলে কামানের গোলা ছাড়া তাকে ভাঙতে পারবে না কেউ!

আর সেই লৌহ-দ্বারের চাবি থাকত স্বয়ং দুর্গস্বামীর কাছে।

পথের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে উন্মাদিনী-প্রায় হতভাগিনী মা মিচেল সেই অজ্ঞাত পরিচয় কৃষকের কাছ থেকে ঠিক খবরটাই পেয়েছিল—তার তিন হারিয়ে যাওয়া সন্তান—তিনটি শিশু—রেণিজঁা—গ্রয়েলেন আর জর্জেট এখন এখানেই—এই লা-টুর্গের সেতু প্রাসাদে।

লঁাতেনা। বীর, রাজতন্ত্রের আশাভরসা ; যাঁকে নিয়ে একদিন অতি গোপনে ক্লেমোর জাহাজ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল জার্সি দ্বীপ থেকে, যে লঁাতেনার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন বয়বার্থেলো নিজেদের বলি দিয়ে, যে লঁাতেনাকে অসহায় দেখে টেলেমার্কের মতো ভিক্ষুক আশ্রয় দিয়েছিল, যে লঁাতেনার হাতে নিজের সৈনাপত্য দিয়ে গ্যাভার্ড নিশ্চিত হয়েছিলেন, সেই লঁাতেনা—ভেণ্ডির বিদ্রোহের নায়ক—রাজতন্ত্র পুনরুত্থানের জন্য অনেক যুদ্ধ করলেন। কিন্তু ভাগ্য তাঁর বিরূপ।

জয়লক্ষ্মী একবারের জন্যও তাঁকে মালা দিলেন না।

বারবার—বারবার তিনি নির্মমভাবে পরাজিত হলেন নিজেরই বংশধর, তাঁর নিজেরই ভাইপোর ছেলে, তাঁর নাতি জোভেঁর হাতে ; যার জন্য তিনি নাকি দিনে সাতবার হলফনামা পড়তেন—'দাঁড়াও ; ধরি একবার—গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।'

কিন্তু জোভেঁকে তিনি ধরবেন কি ? জোভেঁর ভয়ে এখন নিজেই তিনি ফুজিয়ার্স মহারণ্যের প্রান্তসীমায় তিনপাহাড়ী এই লা-টুর্গ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছেন। সাতহাজার কৃষক সেনা নিয়ে একদিন মাথার উপর তরওয়াল নাচিয়ে তিনি সাদা ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন, আজ তাঁর শেষ সঙ্গী মাত্র আঠের জন।

নেহাত বাপ পিতামহের কাছ থেকে পাওয়া এই লা-টুর্গ তাঁর একান্ত সম্পত্তি—তাই রক্ষে।

আর জীবনের পাশাখেলা কি নির্মম—!

এই লা-টুর্গ দুর্গের ভিতরেই তাঁর জীবনের একটা বিরাট অংশ

কেটেছে। কেটেছে এক শিশুসঙ্গী আর তার শিক্ষককে নিয়ে। শিশুটি তাঁর নাতি, ভাইপোর ছেলে; সেই জোভেঁ! শিক্ষক সিমোর্দে।

আজ দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি অবরুদ্ধ। সঙ্গী আঠেরজন।

বাইরে বিশাল সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে অবরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী জোভেঁ—আর তাঁর সঙ্গে সিমোর্দে।

ঐ জোভেঁ তার শৈশব—কৈশোর—আর যৌবনের প্রথম দিনগুলো কাটিয়েছেন দুর্গ সংলগ্ন সেতুপ্রাসাদের মূল্যবান পুস্তকাগারে, সেখানে প্রতিনিয়ত তাঁকে সাহচর্য দিয়েছেন ঐ সিমোর্দে।

একে কি বলা যাবে?

যে তিনটি মানুষের একত্র জীবনযাপনের অসংখ্য সুখস্মৃতির নীরব সাক্ষী এই লা-টুর্গ; সেই লা-টুর্গেই আজ ওই তিনটি মানুষের জীবনের এক চরম অধ্যায় রচিত হতে চলেছে।

ইতিহাস মাঝে মাঝে এমন নির্মম পরিহাস করে কেন?

অবরুদ্ধ লঁতেনা।

অবরোধকারী জোভেঁ।

জোভেঁর নিয়ামক সিমোর্দে।

এই পরিস্থিতিতে এক সন্ধ্যে।

আকাশে একটি-দু'টি তারা ফুটি-ফুটি করছে।

দুর্গশিখর থেকে বেজে উঠল একধরনের শিঙাধ্বনি; এ আওয়াজের অর্থ আলাদা। অবরুদ্ধ লঁতেনা বাহিনী কথা বলতে চায় অবরোধ-কারীদের সঙ্গে।

নীচ থেকেও একইভাবে জবাব এল।—'ঠিক আছে—কি বলবে বল।'

চারিদিকে আরণ্য নিস্তব্ধতা। রণ-কোলাহলে পাখিরাও বুঝিবা ভুলে গেছে কোনো একদিন এখানের বৃক্ষশাখায় ছিল তাদের নীড়!

সেই ভয়াল শব্দহীনতার মধ্যে শিঙাধ্বনি।

দুর্গের ভিতর থেকে কথা বলে উঠল ইমেন্থ। সেই ইমেন্থ—যার আরেক নাম শয়তান! যার নামে অজ্ঞান শিশুও মাতৃক্রোড়ে আঁতকে ওঠে। নারকীয় হত্যাই যার একমাত্র নেশা। সেই ইমেন্থ এখনো ল'াতেনার দক্ষিণহস্ত।

এদিকে জোভেঁ।

ইমেন্থর গলার স্বর—নীরস, কর্কশ, নির্মম—

—এই দুর্গে তিনটি বাচ্ছা আছে—জান কি?

—জানি।

—বাচ্ছা তিনটিকে কি তোমরা বাঁচাতে চাও?

—নিশ্চয়ই।

—তাদের আমরা বাঁচতে দিতে পারি, তবে শর্ত আছে।

—কি শর্ত?

—আমরা আছি মোট উনিশজন। ঐ বাচ্ছা তিনটিকে বাদ দিয়ে।

—তাতে কি?

—বাচ্ছা তিনটিকে আমরা তখনি বাঁচতে দেব—যদি তোমরা আমাদের এই উনিশজনকে বিনা বাধায় চলে যেতে দাও।

—অসম্ভব।

—তাহলে কিন্তু বাচ্ছা তিনটি মরবে।

কি জবাব দেবেন জোভেঁ!

এরপর দু'পক্ষই নীরব।

পরদিন। সারাদিনের প্রখর তাপ বিকিরণে ক্লান্ত সূর্যদেব অস্তাচলের দিকে পা বাড়িয়েছেন।

নৃশংস, নির্মম, শয়তানী বুদ্ধিতে ভরা ইমেন্নু। ইমেন্নুর অনেকদিনের সাধ আজ পূর্ণ করবে সে।

বাচ্ছা তিনটি তখন ঘুমিয়ে।

ইমেন্নু সেই ঘুমন্ত বাচ্ছা তিনটিকে নিয়ে এল একে একে সেতু-প্রাসাদের ভিতরে সেই অমূল্য গ্রন্থাগারে—যেখানে শুধু বই-আর-বই।

—তারপর?

তারপর ইমেন্নু যা করতে চলল—নৃশংসতার ইতিহাসে তার কোনো তুলনা ছিল না—নেইও।

বহুদিন ধরে—বহু ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে লৌহদরজার তলায় পাথরের গায়ে সে তৈরি করেছে একটা ফুটো।

আজ প্রথমে সে বাচ্ছা তিনটিকে নিয়ে এসে শুইয়ে দিল পুস্তকাগারে তিনটি বিছানায়। বই তো রয়েইছে। তাতেও ইমেন্নু নিশ্চিত নয়। সারা ঘরে ছড়িয়ে রাখল মুহূর্তে আগুনে জ্বলে ওঠে এ ধরনের জিনিস।

একটা সুতো—লম্বা সুতো সে তৈরি করেছে। সুতোটাকে কয়েকদিন ধরেই গন্ধকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে করে তুলেছে সহজদাহ্য। প্রথমে লৌহদরজার বাইরে রেখে এল সুতোটির এক প্রান্ত। তারপর দীর্ঘ ধৈর্য ধরে তৈরি করা ফুটোর মধ্য দিয়ে গলিয়ে আনল সুতোটা। নিয়ে এল পুস্তকাগারে। সেখানে নিদ্রিত বাচ্ছা তিনটির বিছানার সঙ্গে ভালো করে জড়িয়ে দিল সুতোটা। সুতোর অনেকটা অংশ ছড়িয়ে রাখল ঘরের মেঝেতে—সহজদাহ্য পদার্থগুলিকে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে। তারপর দরজা বন্ধ করল। চাবি দিয়ে দিল লোহার দরজায়।

ব্যস্। সেতুপ্রাসাদে রইল কেবল তিনটি শিশু। সেই তিনটি শিশু। লা-সৌদ্রেতে যাদের ঘিরে আনন্দে একসময়ে চিৎকার করে উঠেছিল লালটুপি পল্টনের দল; যাদের জন্য মা মিচেল কেঁদে কেঁদে পাগল। যাদের লঁাতেনা স্থান থেকে স্থানান্তরে পাঠিয়েছেন। সেই রেণিজঁা—গ্রয়েলেন আর জর্জেট। লঁাতেনা—তাদেরই সম্পর্কে

একসময়ে বলেছিলেন—'পরে ভেবে দেখব কি করা যায় ওদের নিয়ে।' আরেকসময়ে বলেছিলেন 'ওরাই হবে দাবার বোড়ে'।

ওরাই ছিল তাঁদের শেষ মুক্তিপণ।

যুদ্ধ! যুদ্ধ কি ভয়ঙ্কর। তিন তিনটি অবোধ শিশু—তারা এই মারণযজ্ঞে শকুনির হাতের পাশা!

কিন্তু লাঁতেনাও কি জানেন এই মুহূর্তে ইমেনু কি ভেবে রেখেছে—কি করতে চলেছে!

সন্ধ্যে হয়ে এল। আঁধার ঘনিয়ে উঠল। জোভেঁ তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ করলেন দুর্গ। অদ্ভুত—অসম যুদ্ধ। কতক্ষণ চলতে পারে এ যুদ্ধ! একদিকে মাত্র উনিশজন। বাইরে সাধারণতন্ত্রী সৈন্যরা বাড়তে বাড়তে চারহাজারে পৌঁছেছে। সাধারণতন্ত্রীদের কাছে এইটাই শেষ আক্রমণ—লা-টুর্গ দখল করলে মার্কুইসের দাঁড়াবার আর কোনো জায়গা নেই। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষণার কোনো নায়ক আর অবশিষ্ট থাকবে না। তাই তাদের আক্রমণ প্রবল—উৎসাহে তাদের শৌর্য যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

কামান। কামান দাগছেন জোভেঁ। আশৈশব বর্ধিত তিনি যে লা-টুর্গে, তার কোথায় দুর্বলতা তা তো তিনিই জানেন একমাত্র।

বহু পুরনো পাথরের দেওয়াল একসময়ে ভেঙে পড়ল। দুর্গ চত্বরে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল সাধারণতন্ত্রী সেনারা।

লাঁতেনা বুঝলেন—আর রক্ষে নেই। পালাতে হবে। এখনো পালানোর শেষ চেষ্টা করার উপায় একটা তাঁর আছে। দুর্গ থাক—নিজেদের বাঁচানো আগে দরকার—এই ভেবেই তিনি সরিয়ে ফেললেন গৃহ-প্রাচীরের একটা অংশ। বহু প্রাচীনকালেই এটা তৈরি করেছিলেন দুর্গস্বামীরা—বিপদের জন্য আগাম ব্যবস্থা। নইলে পাঁচিল সরবে কেন? আসলে ওটা গুপ্তদ্বার। তার আড়ালে রয়েছে একটা সুড়ঙ্গ।

চলে গেছে ফুজিয়ার্সের বেশ ভিতরে। এখান দিয়েই আপাতত পালাতে হবে। উনিশজনই নেমে পড়লেন সুড়ঙ্গে।

পালাতে হবে, কিন্তু পালালেই তো হবে না। পিছনে যাতে শত্রুরা ধাওয়া করতে না পারে তারো ব্যবস্থা করে যেতে হবে। সুতরাং সুড়ঙ্গে ঢুকে গুপ্তদরজা আবার বন্ধ করতে গেলেন মার্কুইস।

হায়! এ আবার কোন দুর্ভাগ্য? দরজা তো আর বন্ধ হয় না। সরে যাওয়া পাথুরে দরজা আর নিজের জায়গায় ফিরছে না। বহুদিনের অব্যবহারেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক দরজা আর স্বস্থানে ফেরে না। তার মানে গুপ্তদ্বার খোলা থেকে যাচ্ছে। আর দরজা খোলা রেখে পালানো আর না পালানোতে কোনো ফারাকই নেই।

কথাটা তুলল ইমেন্নুই।

—দরজা খোলা রেখে পালালে, কয়েক মিনিটেই আমরা ধরা পড়ে যাব; তারপর গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে আমাদের শরীর। এভাবে দরজা অরক্ষিত রেখে পালানো যায় না। তার থেকে আপনি বাকীদের নিয়ে চলে যান। আপনি রক্ষা পেলে আবার রাজতন্ত্রসেবীরা আপনাকে কেন্দ্র করে সমবেত হবার চেষ্টা করতে পারবে—সুতরাং অন্যদের নিয়ে আপনি পালান। আমি থাকি। এতো ছোট সুড়ঙ্গমুখ—আমি একাই—যতক্ষণ না মরি—মরতে আমাকে হবেই—কিন্তু যতক্ষণ না আমাকে মারতে পারছে—ততক্ষণ আমি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারব। সেটা যদি আধঘণ্টাও হয়—আপনি পারবেন অনেকদূর চলে যেতে। আপনি চলে যান।

ইমেন্নু! ইমেন্নু শয়তান। কিন্তু এখন ইমেন্নুর কথাগুলোর সারবত্তা আছে। লাঁতেনা মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না—তাঁর এতকালের সহযোদ্ধার এই আত্ম বিসর্জনের প্রস্তাব। কিন্তু অবস্থার চাপ এবং ভবিষ্যতের আশা—একদিন যেমন ক্লেমোর আর সেখানকার সঙ্গীসাথীদের বিসর্জন দিয়ে লাঁতেনাকে পালাতে উদ্বুদ্ধ

করেছিল, একদিন যেমন ভিক্ষুক টেলেমার্কের অপরিচ্ছন্ন কুটিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল—আজও তাঁকে সে ভাবেই বাধ্য করল।

লাঁতেনার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা তাঁর বন্ধু-সহকর্মী-অনুচররা যতটা বোঝে—লাঁতেনা বুঝি তার থেকে বেশীই বোঝেন। আভিজাত্য আর ভিতরের আত্মশ্লাঘা—লাঁতেনাকে তাঁর নিজের কাছে সর্বদাই মূল্যবান করে তোলে। আজ তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

ইমেনুকে একবার শেষ আলিঙ্গন দিয়ে বিদায় নিলেন মার্কুইস। বিদায় বেলায় দুর্গস্বামীর কাছে চাবির গোছা সমর্পণ করল ইমেনু। তখনো মার্কুইস জানেন না—এই চাবির মধ্যে রয়েছে কি ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্র।

লাঁতেনা চলে গেলেন। সঙ্গে সতেরজন সঙ্গী। সুড়ঙ্গপথে অনেকদূর গিয়ে ঘোর জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন সসঙ্গী মার্কুইস। পরেরদিন কোনো একটি বিশেষ জায়গায় মিলবার নির্দেশ দিয়ে সঙ্গীদের বিদায় দিলেন মার্কুইস। লাঁতেনা এখন একা। ঘোর জঙ্গলে একা।

ওদিকে তখন সাধারণতন্ত্রী সৈনিকেরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। ইমেনু তরবারি হাতে একা সুড়ঙ্গ পথে। যে সামনে আসছে সেই গলি পথে, ইমেনুর তরবারি তাকেই দু'টুকরো করে ফেলছে। একহাতে তার তরওয়াল—শত্রু নিধনে উন্মুখ—, আর এক হাতে তার সযত্ন রক্ষিত সেই গন্ধক সুতোর এক প্রান্ত। একবার করে একটি শত্রু নিধন করে—একবার করে লক্ষ্য করে সুতোটিকে।

হঠাৎই দূর থেকে একজন ছুঁড়ে মারল একটি বল্লম। সোজা এসে ইমেনুর পেটে বিঁধে গেল সেটা। বেরিয়ে এল ইমেনুর নাড়িভুড়ি। কিন্তু ইমেনু নির্মম। নির্মমতার জন্য প্রয়োজন মনের কঠিন দৃঢ়তা। মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে ইমেনু চেপে ধরল তার পেট। মৃত্যুর হাতছানি তার চোখের সামনে। তবু তার শয়তানী চিন্তার এতটুকু খামতি হয়নি। একহাতে পেট চেপে ধরে অন্য হাতে সে গন্ধকসুতোয়

আগুন দিল। তারপর—সমস্ত দমটুকু একসাথে করে দিতে থাকল ফুঁ। একের পর এক ফুঁ। যতক্ষণ না সুতো জ্বলতে জ্বলতে লৌহ-দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল—ততক্ষণ ইমেন্থরও ফুঁ-এর বিরাম নেই।

আগুন ভিতরে ঢুকেছে দেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার অবকাশ পেল শয়তান ইমেন্থ।

বাজপড়া গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছেন লাঁতেনা। বারবার নিজের জীবন বাঁচিয়েছেন তিনি অপরের দাক্ষিণ্যে। এখন তিনি একা। চারপাশে ঘোর জঙ্গল। মাথার মধ্যে এখনো রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দুরাশা। ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আপাতত তো একাই যেতে হবে! ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আজীবনের স্মৃতি বিজড়িত লা-টুর্গ দুর্গ। একবার পিছন ফিরে তাকালেন তিনি সেই স্মৃতি মাখা বাসগৃহটির দিকে।

তাকালেন লাঁতেনা।

তাকালেন, দেখতে চেয়েছিলেন কি—আর দেখলেন কি?

দেখলেন দাউ দাউ করে জ্বলছে তাঁর বহু সাধের দুর্গপ্রাসাদের পুস্তকাগার।

আগুন। আগুন দেখা তাঁর প্রথম নয়। আগুন তিনি নিজেও অনেক জ্বালিয়েছেন। আজকে তাঁরই দুর্গ, তাঁরই গ্রন্থাগার, আগুনে জ্বলছে—তাতে কষ্ট পেলেও বিস্মিত হবার মতো তো কিছু নেই! লাঁতেনাও তাই খুব একটা বিস্মিত প্রথমে হন নি। আগুনটা জ্বলেছে, কে জ্বালিয়েছে—কেন জ্বলেছে এ নিয়ে খুব একটা ভাবনার কারণ তো বহু যুদ্ধের নায়কের হবার কথা নয়; তাই লাঁতেনার সে রকমের কোনো একটা ভাবনা হয়ওনি।

কিন্তু হঠাৎই। হঠাৎই সেই নির্মম, নৃশংস, যার নামে গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর আঁতকে ওঠে—সেই কঠিন কঠোর হৃদয় লাঁতেনাও

আঁতকে উঠলেন। বিস্ময়ে—আতঙ্কে বুঝিবা দিশাহারা হবার উপক্রম।

লাঁতেনা দেখলেন লেলিহান শিখায় প্রজ্বলন্ত পুস্তকাগারের খোলা জানালায় ভয়ার্ত তিনটি শিশুর মুখ!

আর তখনি—তখনি খাদের ওপাশে ফেটে চৌচির হয়ে পড়ল এক নারীর আর্ত কান্না। আর লাঁতেনার বুকের মধ্যে সে কান্না মুগুরের ঘা মারল।

মর্মন্তুদ সে কান্না! হাহাকার সে কান্নায়। সব হারানোর আর্তিতে ফেটে পড়ছে সে কান্না।

—ও কি? ওরা কারা? ওরাই তো আমার দুধের বাছারা! ওরাই তো আমার ছেলেমেয়ে। কে আছ—? বাঁচাও। বাঁচাও। আগুন! আগুন! ওগো তোমরা কে কোথায় আছ আমার বাচ্ছা তিনটেকে বাঁচাও। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না—আমার বাচ্ছাগুলো আগুনে পুড়ে মরছে। ঐতো আমার রিনি—গ্রয়েলা—জর্জেট। বাঁচাও—বাঁচাও।

কিন্তু কে বাঁচাবে—কিভাবে বাঁচাবে?

চারহাজার সৈন্য রয়েছে। রয়েছেন স্বয়ং জোভেঁ। কিন্তু কিভাবে বাচ্ছা তিনটেকে বাঁচানো যায় কেউ বুঝতে পারছে না।

বাইরের দিক থেকে ঐ বইএর ঘরে ওঠা অসম্ভব। তিনতলা সমান খাড়া দেওয়ালের উপর ওই ঘর। একমাত্র সম্ভব দুর্গের ভিতর দিক দিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ। কিন্তু সেখানে তো আর এক বাধা। লোহার দরজা। সেতো বন্ধ। তাতে চাবি।

এদিকে তখন লাঁতেনা। একা দেখছেন ঐ ভয়াবহ দৃশ্য। শুনছেন এক মায়ের কান্না। তাঁর মনে পড়ছে এক এক করে অনেক কথা।

'—তিনটে বাচ্ছা আছে তাদের নিয়ে কি করব?'—ট্যানীতে গ্যাভার্ডের জিজ্ঞাসা।

'—নিয়ে চল। পরে ভাবব কি করা যায় ওদের নিয়ে।'

ডলের যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করার সময়ে ইমেন্থু জিজ্ঞাসা করেছিল—

'—সেই বাচ্ছা তিনটেকে নিয়ে কি করব বুঝতে পারছি না।'

'—ওরাই দাবার বোড়ে। ওদের লা-টুর্গে পাঠাও।'

গত সন্ধ্যেয় ইমেন্থুকে তিনিই নির্দেশ দিয়েছিলেন জোভেঁর সঙ্গে কথা বলার।

'—বাচ্ছা তিনটেকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি যদি আমাদের চলে যেতে দাও নিরাপদে।'—ইমেন্থু বলেছিল।

জোভেঁর উত্তর ছিল—'অসম্ভব।'

'—তাহলে বাচ্ছা তিনটে মরবে।'—ইমেন্থুর উত্তর ছিল এটাই।

এক এক করে মনে পড়ে লাঁতেনার। আসলে ইমেন্থুর কথাগুলো তো তাঁরই কথা। তিনি জোভেঁকে জানেন। জানেন জোভেঁর মনটা নরম। শিশুদের মৃত্যুর আশঙ্কায় সে মেনে নিতেও পারে এই অসম্ভব প্রস্তাব—এই ভেবেছিলেন তিনি। আসলে তিনি জোভেঁর অন্তঃকরণ নিয়ে একটা চাল দিতে চেয়েছিলেন—দাবার বোড়ের চাল। ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন। তারপর—? তারপর নিজের জীবনের তাগিদে—পলায়ন তৎপর লাঁতেনা ভুলেই গেছেন শিশু তিনটির কথা।

ওদিকে তখন জোভেঁ। হায় জোভেঁ! মাথার চুলগুলো ছিঁড়ে ফেলছেন নিজের অসহায়তার কথা ভেবে। কিছুতেই কি বাঁচানো যাবে না ঐ শিশু তিনটিকে!

ঐযে—ঐযে ওদের মা চিৎকার করে কাঁদছে—

—ওরে দস্যু। ওরে খুনে! ওরে ডাকাত সব। আমার বাচ্ছাগুলোকে তোরা পুড়িয়ে মারছিস! কে আছ বাঁচাও ওদের। বাঁচাও।

লাফিয়ে পড়তে যায় মিচেল। সামনে খাদ—তাতে লাফ দিয়েই যেন সে নিজেই তার সন্তানদের রক্ষা করবে।

সৈনিকেরা তাকে আটকাতে পারছে না—এমনি আছাড়ি পিছাড়ি তার কান্না আর ছটফটানি।

জোভেঁ হাহাকার করে ওঠেন—

—চাবি। চাবিটা। ঐ লোহার দরজার চাবিটা! কিন্তু সেটাতো লাঁতেনা নিয়ে ঐ গুপ্ত দরজা দিয়ে পালিয়েছেন।

—সেই গুপ্ত দরজা দিয়েই আবার চাবি নিয়ে ফিরে এসেছে লাঁতেনা।

গম্ভীর এক কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল সবাই। কে ও? গুপ্তপথের দরজায় দাঁড়িয়ে—বৃদ্ধ-সমুন্নতশির, ঋজু-ব্যক্তিত্বে অলঙ্ঘ্য—মার্কুইস দ্য লাঁতেনা।

সকলের বিস্মিত দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করলেন লাঁতেনা। সোজা এগিয়ে গেলেন লোহার দরজার কাছে। খুলে ফেললেন দরজা। আগুনের বন্যা ছুটে এল দরজা দিয়ে।

আঁতকে পিছু হটে এল সৈনিকের দল। কিন্তু লাঁতেনা হারিয়ে গেলেন সেই আগুনের মধ্যে। বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। সমস্ত গ্রন্থাগারটা জ্বলছে। কি ভয়ঙ্কর সেই আগুনের তেজ। গন্ধক, সহজদাহ্য অন্য পদার্থ, তুলোর বিছানা, কাঠ—আগুনের খিদে মেটাবার সব উপকরণ রয়েছে—আগুন জ্বলে যাচ্ছে তার আনন্দে।

সেই আগুনের মধ্যে—এক বৃদ্ধ আর তিন শিশু।

নীচের সৈন্যরা হঠাৎই লক্ষ্য করল গরাদবিহীন বাতায়ন পথে নেমে আসছে বহু প্রাচীন যুগের এক সুদীর্ঘ মই। গ্রন্থাগার সংলগ্ন কোনো অজানা কোণে লুকোন ছিল এটা—বোধকরি জানতেন একা লাঁতেনাই। সেই মই নেমে আসছে। মাটি ছুঁয়েছে কি ছোঁয়নি মইটা—আনন্দে উৎসাহে সৈনিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল মইটার উপর। প্রত্যেকটা ধাপে একজন করে সৈনিক। সব থেকে উপরে যে তার নাম র‍্যাহুব।

বাতায়ন পথে এসে দাঁড়ালেন লাঁতেনা। তাঁর কোলে গ্রয়েলেন। গ্রয়েলেনকে তিনি তুলে দিলেন র‍্যাহুবের হাতে। র‍্যাহুব দিল নীচের সৈনিকটিকে। সে দিল তারপরের জনকে। এইভাবে গ্রয়েলেন এসে পড়ল তার মায়ের কোলে! মা—তার মা। মায়ের কোলে তার হারানো সন্তান। এই ভাবেই নেমে এল রেণিজাঁ। বাকী জর্জেট।

পাষাণহৃদয়, ঘরজ্বালানো, নরহন্তা, নৃশংস, নির্মম লাঁতেনা! বৃদ্ধ লাঁতেনা! জানলায় দাঁড়িয়ে। কোলে তাঁর জর্জেট। র‍্যাহুব হাত বাড়িয়ে। কিন্তু যত দ্রুত তিনি গ্রয়েলেন এবং রেণিজাঁকে তুলে দিয়েছেন র‍্যাহুবের হাতে, জর্জেটকে তো তা দিচ্ছেন না? তবে?

দিচ্ছেন না লাঁতেনা। দিচ্ছেন না—কেননা পরম আদরে তিনি জর্জেটকে বুকে জড়িয়ে ধরছেন। তার অতি কচিমুখটাকে ভরিয়ে দিচ্ছেন স্নেহ চুম্বনে। তাই সময় লাগছে। তারপর—খুব যত্নসহকারে তুলে দিলেন তাকে র‍্যাহুবের হাতে। চোখ দু'টো তাঁর টলটল করছে—আগুনের আভায় সে দু'টো তখন যেন কিসের আভায় চকচকে হয়ে উঠেছে।

আঃ। কতদিন বাদে—কত কাণ্ড করে মা ফিরে পেয়েছে তার হারানো সন্তানদের।

ওঃ। কতদিন বাদে শিশুরা ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো মাকে।

ফুজিয়ার্সের অরণ্য তখন সৈনিকদের আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ। এই মিলন দৃশ্যে যে আনন্দ—তার তুলনা আর কোথায় পাওয়া যাবে? সৈন্যদের চিৎকারে ফুজিয়ার্স পরিণত হয়েছে উৎসব প্রাঙ্গণে। ওদিকে তখন সেতু প্রাসাদ পরিণত হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। কিন্তু লাঁতেনা—লাঁতেনা কোথায়?—লাঁতেনা আছেন!

সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সেই মই বেয়ে নেমে আসছেন লাঁতেনা। নীচে চারহাজার সাধারণতন্ত্রী সৈনিক। মইয়ের ধাপে লাঁতেনা একা। তবু শির উন্নত। চারহাজার সৈনিক তখন ভুলেই

গেছে কে ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ, কি তার পরিচয়! বহ্নিমান আগ্নেয়গিরির দিকে যে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে মানুষ—তারাও তাকিয়ে আছে

তুলে দিলেন তাকে র‍্যাহুরের হাতে··· পৃষ্ঠা ১২৪

ঐ অশীতিপর বৃদ্ধের দিকে সেই বিস্ময়ঘোর দৃষ্টি নিয়ে। নেমে আসছেন

যিনি তিনি যেন অনেক দূরের কোনো গ্রহ থেকে আসছেন—এমনি এক মহিমান্বিত তাঁর ভঙ্গি।

ধীরে—অতি ধীরে ভূমিস্পর্শ করলেন লাঁতেনা। জোভেঁ সহ চারহাজার সৈন্য তখনো ঘোরে আচ্ছন্ন।

তারই মধ্যে—অত্যন্ত শান্তভাবে একজন তাঁর কাঁধ স্পর্শ করলেন, স্পষ্ট অথচ কাটাকাটা তাঁর উচ্চারণ—

—সাধারণতন্ত্রের নামে আমি আপনাকে বন্দী করলাম।

সিমোর্দে তাঁর কর্তব্য ভোলেন নি।

—অবশ্যই।—শান্ত স্বর লাঁতেনার। কোনো দিকে না তাকিয়ে কেবল ঘাড়টা নাড়লেন তিনি।

## চোদ্দ

লাঁতেনা। সাধারণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শত্রু লাঁতেনা। তিনি বন্দী। বিচার হবে। সামরিক বিচার। বিচার করতে হয় তাই বিচার সভা। না হলে রায় কি হবে তা সকলেরই জানা। কারিগররা ব্যস্ত গিলোটিনের মঞ্চ তৈরির জন্য। গিলোটিন যে হবেই—সে তো নিশ্চিত।

সামরিক বিচার সভা বসেছে। বিচারক তিনজন। সিমোর্দে তো আছেনই। তিনিই সভাপতি। আর আছেন জোভেঁর সহকারী গেশাম্প। তৃতীয় জন—? না জোভেঁ নয়। হাজার হলেও লাঁতেনা জোভেঁর আত্মীয়। তাই বিচারসভায় জোভেঁ নেই। তাঁর জায়গায় আছেন লালটুপি পল্টনের এক সার্জেন্ট—র‍্যাডুব।

বিচার শুরু হবে। তার আগে বন্দীকে আনা দরকার। তাকে সামনে রেখেই বিচার হবে।

—বন্দীকে নিয়ে এস।—হুকুম দিলেন সিমোর্দে।

সৈনিকেরা ছুটল।

বন্দীশালার দরজা খুলে গেল। দু'জন সৈনিক বন্দীকে নিয়ে আসছে। নিয়ে আসছে বলা ভুল। বন্দী আসছেন। সৈনিকেরা নীরবে তাঁকে অনুসরণ করছে মাত্র।

কিন্তু—কিন্তু এ কে?

বন্দীশালার দরজা খোলা হয়েছে। সেই দরজা দিয়েই তো বন্দীশালা থেকে ইনি বেরিয়ে এলেন! কিন্তু ইনি কে? ইনি তো লাঁতেনা নয়।

না। লাঁতেনা নয়।

বেরিয়ে এসেছেন যিনি—তিনি লাঁতেনার একমাত্র উত্তরাধিকারী, মার্কুইস দ্য লাঁতেনার ভ্রাতুষ্পৌত্র, সাধারণতন্ত্রের অজেয় রণনায়ক, বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পতাকাবাহী তরুণ ভাইকাউন্ট জোভেঁ।

উপস্থিত সৈন্যরা অবাক। হতবাক অন্য দু'জন বিচারক। সিমোর্দে বিস্মিত। অনেকক্ষণ তিনি চেয়ে রইলেন জোভেঁর দিকে। তারপর সৈনিকদের বললেন,—

—ব্যাপারটা কি? আমি তো বন্দীকে আনতে বলেছি।—গলার স্বরটা কি স্বাভাবিক শোনাল নিজের কাছেই? সিমোর্দে বুঝলেন না।

সৈনিকরা কি জবাব দেবে? উত্তর দিলেন জোভেঁই।

—ওরা ঠিকই করেছে। আমিই বন্দী।

সবাই চুপ। জোভেঁও কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইলেন।

—গতরাতে আমি মার্কুইস দ্য লাঁতেনাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

বাজটা যেন সরাসরি সিমোর্দের মাথাতেই পড়েছে। নিস্পন্দ। শরীরের মধ্যে সেই আতঙ্কটা যেন রক্তবাহী নালিকাগুলোকে শুষে নিচ্ছে। পাণ্ডুর হয়ে উঠছে সিমোর্দের মুখ। আশঙ্কাই সত্যি হতে চলেছে! অনেক অনেকক্ষণ বাদে ক্ষীণ স্বর বেরিয়ে এল সিমোর্দের গলা দিয়ে।

—কিন্তু কেন?

—কেন !

—তুমি—তুমি তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলে লাঁতেনাকে বধ করতে।
হাহাকার যেন ধ্বনিত হয় সিমোর্দের গলায়।

—ছিলাম। অবশ্যই ছিলাম। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম আমি। আমার অঙ্গীকারই ছিল—লাঁতেনাকে বধ করব আমি।—ধীরে ধীরে স্বপ্নালু হয়ে ওঠে জোভেঁর চোখ দু'টো। দৃষ্টি হারিয়ে যায় কোন সুদূরে।

—কিন্তু সে কোন লাঁতেনা বলুন তো? বর্বরতা, নৃশংসতা, হত্যা, অগ্নিকাণ্ড, অত্যাচার যার নেশা, রাজতন্ত্রের অন্ধ স্তাবক যে লাঁতেনা, যুদ্ধ আর রক্ত যার লালসা মেটায়—সেই লাঁতেনা কোথায়? তাকে পেলে আমি আমার প্রতিজ্ঞা পূরণে তিলমাত্র দ্বিধা করব না; তাকে পেলে এখনো আমি নির্মমভাবে হত্যা করব; তার নিধনে আমি এখনো বদ্ধপরিকর। কিন্তু সে লাঁতেনা কোথায়? তাকে এনে দিন—আমি এই মুহূর্তে তার জীবন সংহার করব। কিন্তু কাল সে লাঁতেনাকে পেলাম না তো! সে কোথায়? যে মানুষটাকে কাল পেলাম—দেখলাম—তার চেহারাটা সেই লাঁতেনার, কিন্তু আচরণে সে লাঁতেনা কোথায়? এঁকে তো কোনোদিন দেখিনি—এঁকে তো চিনি না। ইনি যে বীর—মহাবীর! মহাবীরের থেকেও যদি বড় কিছু থেকে থাকে—ইনি তো তাই। বীরের চেয়েও—মহাবীরের চেয়েও অনেক অনেক বড়। ইনি যে মানুষ—মহামানুষ। অত্যাচারী, অনাচারী, নৃশংস, নির্মম, খুনে লাঁতেনাকে তো অনেক আগেই নিধন করে দিয়েছেন আরেক লাঁতেনা—তিনি মানুষকে ভালোবাসেন, মনুষ্যপ্রেমী, শিশুপ্রেমী, আর্তপ্রেমী, নির্ভীক। এই ত্রাতা—মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ লাঁতেনাকে তো আমি বধ করতে অঙ্গীকার করিনি। এঁকে হত্যা করার অধিকার কোথায় আমার?—চুপ করে যান জোভেঁ। একটু হাসি ঠোঁটের উপর। এক স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল সে হাসি।

—তাই আমার বিবেক কোনো তর্কে গেল না। বুদ্ধির থেকেও

বড় হয়ে উঠল আমার বিবেক—তারই প্রেরণা আমাকে নির্দেশ করল। আমি সে নির্দেশ পালন করেছি। আমি মানুষ লাঁতেনাকে মুক্ত করে দিয়েছি।—আবার হাসলেন জোভেঁ। সিমোর্দের দিকে তাঁর চোখ। সে চোখে যেন জ্যোতি।

—হ্যাঁ পিতা। আমি তাকে মুক্ত করে দিয়েছি।—

সিমোর্দে তাকাতে পারছেন না। তবু—তবু—কঠিনহৃদয়, কর্তব্যে ও অঙ্গীকারে অবিচল সিমোর্দে মুখ তুললেন। স্বর ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ।

—পুত্র। তুমি কি জাননা রাজপক্ষের কোনো বন্দী-সেনাকে মুক্ত করে দিলে সাধারণতন্ত্রের সেনানীদের কি শাস্তি পেতে হয়?

—জানি। নিশ্চয় জানি। সে শাস্তি মৃত্যু।

—তবে?

—আমার অপরাধের শাস্তি নিতে তো আমি প্রস্তুত পিতা। আমি তো মৃত্যুবরণ করতেই এগিয়ে এসেছি। আমাকে শাস্তি দিন। জয় হোক সাধারণতন্ত্রের।

—মৃত্যু! আপনার মৃত্যু? সাধারণতন্ত্রের সর্বাধিনায়ক হিসেবে আমরা আপনাকে দেখতে চাই।—চিৎকার করে উঠল র‍্যাহুব। 'আপনি যে কাজ করেছেন তার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদই আপনার একমাত্র প্রাপ্য। আপনার জন্য সমস্ত ফরাসী জাতি আজ গৌরববোধ করবে।'

এ বিচারসভায় র‍্যাহুবের চিৎকার মূর্খের হুঙ্কার! সে একাই চিৎকার করে উঠল।

সিমোর্দে জন নিরাপত্তা সমিতির প্রতিনিধি। তিনি রায় দিলেন 'মৃত্যুদণ্ড'। গেশাম্প তাঁর সঙ্গে একমত।

বিচার সভা শেষ হল।

রায়! জোভেঁর—মহাবীর, সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো উজ্জ্বল, ভালোবাসায় বিশ্বাসী, ক্ষমায় উদ্বুদ্ধ, তিরিশ বছরের সেনানায়ক জোভেঁর—'মৃত্যুদণ্ড'।

পরের দিন সকাল।

গিলোটিন তো বসানোই ছিল।

মানুষটা কেবল পাল্টে গেছে।

দয়া, স্নেহ-ভালোবাসায় পূর্ণ, সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অজেয়, মহিমান্বিত জোভেঁর উপর গিলোটিনের ইস্পাত ফলাটা দ্রুত নেমে আসছে শরীর থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করার জন্য। সেকেণ্ড মাত্র সময়—!

একটা গুলি। পিস্তলের আওয়াজ।

কোথায়?

লা-টুর্গের দুর্গম চুড়োয়।

নিজের বুকে নিজে গুলি করেছেন সিমোর্দে।

জোভেঁর মাথাটা গিলোটিনের ঝুড়িতে গড়িয়ে পড়ল।

দুর্গম চুড়ো থেকে সিমোর্দের দেহটা তখন আছড়াতে আছড়াতে দ্রুত নেমে আসছে।

ফুজিয়ার্সের অরণ্যে তখন লাঁতেনা হেঁটে চলেছেন।

সঙ্গে এক নারী। একটি শিশুর হাত ধরে সেও চলেছে।

লাঁতেনার কোলেও একটি শিশু। একহাতে ধরা আরেকটি শিশুর হাত।

অনেক—অনেকদূর তাঁদের হাঁটতে হবে। ট্যানীতে টেলেমার্কের ভাঙা কুটির তো এখান থেকে বহুদূরে!

॥ শেষ ॥

ফরাসী দেশ। ১৭৮৯। রাজাকে সরিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হল সাধারণতন্ত্রের।

রাজার সমর্থকরা সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। বেধে গেল ফরাসী উপকূলে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। ১৭৯৩। রাজার প্রাক্তন সেনাপতি, অশীতিপর বৃদ্ধ, নির্মম, নিষ্ঠুর, নৃশংস লাঁতেনা বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে এসে উপস্থিত হলেন গৃহযুদ্ধে রাজপক্ষীয়দের নেতৃত্ব দিতে। কিন্তু প্রতিপক্ষ কে?

জোভেঁ। তিরিশবছর বয়স! চেহারায় হারকিউলিস, স্বভাবে দার্শনিক। সাধারণতন্ত্রদের অপরাজেয় সৈন্যাধ্যক্ষ। ক্ষমা-ভালবাসায় বিশ্বাসী। গৃহযুদ্ধে কার বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধরলেন?

সিমোর্দে। ছিলেন ধর্মযাজক। দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে পুত্র স্নেহে লালন করেছেন, শিক্ষা দিয়ে বড় করেছেন যাকে—চার বছরের ছাড়াছাড়ির পর তার সঙ্গে সিমোর্দের দেখা হল কি ভাবে? সিমোর্দে তখন কোন অঙ্গীকারে বদ্ধ?

ভাঙা কুটিরে রাত কাটায় আর দিনে ভিক্ষে করে বৃদ্ধ ভিখারি টেলেমার্ক এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে তার ভূমিকা কোথায়?

লড়াই এ মৃত্যুবরন করেছে যার স্বামী-বাবা-মা—সেই হতভাগিনী কৃষক রমণী মিচেল পালিয়ে বেড়ায় তিনটি অবোধ শিশুকে নিয়ে—প্রাণের তাগিদে।

নাইনটি-থ্রি। ফরাসী দেশে সতেরশ' তিরানব্বই এর বীভৎস, মর্মন্তুদ গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে এই চরিত্রগুলির পরিণতি কি? তাই নিয়েই এক বৃদ্ধ ও তিন শিশুর গল্প।